রাজনৈতিক তত্ত্ব পরিচয়: মৌলিক ধারণা

গৌতম মুখোপাধ্যায়

Scanned by CamScanner

Rajnaitik Tatto Parichaya: Moulick Dharana
by Goutam Mukhopadhayay

প্রচ্ছদ : দিলীপ ঘোষ

প্রথম সংস্করণ : নভেম্বর ২০১৮

ISBN: 978-81-933898-8-1

© লেখক

প্রকাশক :

অর্চনা দাস ও সুব্রত দাস

সেতু প্রকাশনীর পক্ষে

১২/এ, শংকর ঘোষ লেন, কলকাতা - ৭০০ ০০৬

ফোন : +৯১ ৩৩ ২২১৯ ০৭০৪, +৯১ ৯৪৩৩০ ৭৪৫৪৮

বিক্রয়কেন্দ্র :

২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭৩

'বুকমার্ক', ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭৩

e-mail : setuprakashani@gmail.com

Website : www.setuprakashani.com

দাম : এক শত কুড়ি

অক্ষরবিন্যাস :

'সাইনোস্যুর', ২৬, যোধপুর গার্ডেন, কলকাতা - ৭০০ ০৪৫

মুদ্রক :

ইমপ্রিন্টা, ১৪৩/২বি, এ.পি.সি. রোড, কলকাতা - ৭০০ ০০৬

Scanned by CamScanner

লেখকের নিবেদন

দীর্ঘদিন ধরে প্রথমে দুর্গাপুর গভর্নমেন্ট কলেজ ও পরে গুরুদাস কলেজে রাজনৈতিক তত্ত্ব বিষয়টি পড়াতে গিয়ে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি, বলা যেতে পারে এই বইটি তারই প্রাথমিক ফসল মাত্র। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা বলার প্রয়োজন বোধ করছি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সি.বি.সি.এস (CBCS) সিলেবাস অনুযায়ী রাষ্ট্রবিজ্ঞান অনার্স-এর প্রথম সেমেস্টারের কোর্স-১-এর পাঠ্যসূচি অনুযায়ী বইটি সহজ সরল ভাষায় লেখার চেষ্টা করেছি।

বইটি প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বহুজনের কাছে আমি ঋণী। এর মধ্যে রয়েছেন গুরুদাস কলেজের মাননীয়া অধ্যক্ষা ড: মৌসুমী চ্যাটার্জী, বন্ধুবর অধ্যাপক শান্তনু বসু (অর্থনীতি শিক্ষক), আমার ভ্রাতৃপ্রতিম অধ্যাপক কৌশিক নন্দী (পদার্থবিদ্যা), আমার বিভাগীয় সহকর্মীবৃন্দ অধ্যাপিকা রিমা চ্যাটার্জী, অধ্যাপিকা সোমালি মুখার্জী, অধ্যাপক অরিজিৎ চৌধুরী ও অধ্যাপক অনিকেত গোস্বামী। গোলপার্কে অবস্থিত শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন লাইব্রেরির কর্মীবৃন্দের কাছেও আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। পারিবারিক পরিসরে বিশেষভাবে লেখার ক্ষেত্রে সাহায্য করেছে আমার জামাতা প্রাক্তন অতিথি অধ্যাপক ও বর্তমান গভর্নমেন্ট মডেল স্কুলের শিক্ষক শ্রী ঋক সরকার, আমার কন্যা অধ্যাপিকা কাবেরী মুখার্জী (যোগামায়াদেবী কলেজ) ও সর্বোপরি আমার স্ত্রী মৌসুমী মুখার্জী। সেতুর কর্ণধার শ্রী সুব্রত দাসের কাছে আমি বিশেষভাবে ঋণী। বলা বাহুল্য বইটির দোষত্রুটির দায় একান্ত আমার।

গৌতম মুখোপাধ্যায়

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
গুরুদাস কলেজ
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
২৮শে সেপ্টেম্বর ২০১৮

Scanned by CamScanner

সূচিপত্র

কোর কোর্স- ১

মডিউল- ১

প্রথম অধ্যায়	রাজনীতির অর্থ ও প্রকৃতি	১
দ্বিতীয় অধ্যায়	রাষ্ট্র, জাতি ও সার্বভৌমিকতা	১৩
তৃতীয় অধ্যায়	ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব— প্রকারভেদ ও আন্তঃসম্পর্ক	২৮
চতুর্থ অধ্যায়	আইন, স্বাধীনতা ও সাম্য— আন্তঃসম্পর্ক	৩৭

মডিউল- ২

পঞ্চম অধ্যায়	অধিকার, ন্যায়বিচার ও স্বাধীনতা	৬০
ষষ্ঠ অধ্যায়	গণতন্ত্র ও কর্তৃত্ববাদ	৮৭
সপ্তম অধ্যায়	নাগরিকতা	১১১

Scanned by CamScanner

প্রথম অধ্যায়

রাজনীতির অর্থ ও প্রকৃতি
(The Meaning and Nature of Politics)

'রাজনীতি' (Politics) কথাটি উচ্চারণ করলেই সাধারণ মানুষের মনে কয়েকটি ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়— রাজনীতি মানেই পার্টি বা দল সংক্রান্ত কোনো ব্যাপার বা রাষ্ট্র সংক্রান্ত কোনো বিষয়। রাজনীতির বাচ্যার্থ রাষ্ট্র বা দলকে ঘিরেই তৈরি হয়েছে। কিন্তু এই ধারণা ঠিক নয়। অধ্যাপক অ্যালান.আর. বল (Alan R. Ball) যথার্থই বলেছেন, "Politics is a universal activity", অর্থাৎ রাজনীতি একটি সর্বজনীন ক্রিয়া। অধ্যাপক বলের মতে, রাজনৈতিক কার্যাবলি শুধুমাত্র রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্র, পার্লামেন্ট, নির্বাচন, ক্যাবিনেট ইত্যাদির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কার্যাবলির সঙ্গে যুক্ত নয় বা তা শুধুমাত্র দলীয় রাজনীতির সমার্থক বা দলীয় রাজনীতিবিদদের কলাকৌশল বোঝায় না। তাঁর মতে রাজনীতির ধারণা অনেক বেশি ব্যাপক। অধ্যাপক বলের মতে, রাজনীতির মূল কথা হল বিরোধ বা দ্বন্দ্ব এবং সেই দ্বন্দ্বের নিষ্পত্তি বা মীমাংসা।

Oxford English Dictionary-তে বলা হয়েছে রাজনীতি হল "Activities associated with the governance of a country or area."

অধ্যাপক জে.বি.ডি. মিলার (J.B.D. Miller)-ও তাঁর *The Nature of Politics* গ্রন্থে রাজনীতি বলতে বিরোধ-মীমাংসা প্রক্রিয়াকেই বুঝিয়েছেন। মিলারের ভাষায় "Man is a universe of interests" অর্থাৎ প্রতিটি মানুষের একাধিক বিষয়ে আগ্রহ থাকে। এছাড়া সমাজে বিরোধ অবশ্যম্ভাবী। তাঁর মতে, "Political activity . . . arises out of disagreement . . ."।

'রাজনীতি'র সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন ব্যাপার। এর প্রধান কারণ হল 'ontological' বা তত্ত্ববিদ্যামূলক এবং 'Epistemological' বা জ্ঞানতাত্ত্বিক উভয় বিষয়েই রাষ্ট্রচিন্তাবিদদের মধ্যে মতের মিল নেই। মার্শ ও স্টোকার (Marsh and Stoker)

Scanned by CamScanner

তাঁদের Theory and Methods in Political Science বইতে বলেছেন, "Ontology is concerned with what we can know about the world and epistemology with how we can know it." সহজ কথায় Ontology হল তত্ত্ববিদ্যা— কী জানা হবে, আর Epistemology হল জ্ঞানতত্ত্ব— কেমন করে জানা হবে। এই দুটি বিষয়েই রাজনীতির পণ্ডিতদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। 'রাজনীতি কী'— এই প্রশ্নেও তাঁরা একমত নন; আবার 'রাজনীতি পাঠের উপযুক্ত পদ্ধতি কী'—তা নিয়েও তাঁদের মতবিরোধ রয়েছে। তাই মার্শ ও স্টোকার রাজনীতির প্রকৃতি আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, "There is a celebration of diversity"। স্যার আরনেস্ট বার্কার (Barker) তাঁর Greek Political Theory: Plato and His Predecessors বইতে লিখেছেন, "Political thought was born in Greece"— অর্থাৎ রাজনৈতিক চিন্তার জন্ম গ্রিস দেশে।

কিন্তু রাজনীতির অর্থ নির্ধারণ করার জন্য শুধু প্রাচীন গ্রিসের কথা ভাবলে আমরা একদেশদর্শিতার দোষে দুষ্ট হব। ভাবতে হবে প্রাচীন প্রাচ্য সভ্যতার কথাও। অধ্যাপক নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী তাঁর 'দণ্ডনীতি' গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে ঋকবেদ, রামায়ণ, মহাভারত (শান্তিপর্ব), কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থে রাজনীতির ধারণা ও বিশ্লেষণ প্রখরভাবেই ছিল। তবে ঐতিহাসিকভাবে এই মতটি এমন সুপ্রতিষ্ঠিত যে গ্রিক 'Polis' বা নগররাষ্ট্র সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনা সূত্রেই ইংরাজি 'Politics' শব্দটির ব্যবহার শুরু হয়েছিল। যার বাংলা প্রতিশব্দ 'রাজনীতি'।

আধুনিক রাজনীতি বিজ্ঞানের সূত্রপাত হয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে ম্যাকিয়াভেলির সময় থেকে। গেটেল ম্যাকিয়াভেলিকে "The first realist in politics" বা রাজনীতিশাস্ত্রে প্রথম বাস্তববাদী বলে চিহ্নিত করেছেন। তিনি রাজনীতিকে ধর্ম ও নৈতিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন (Secularization of Politics) করেছিলেন। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটেনে 'অভিজ্ঞতাবাদ' (empiricism) এবং ফ্রান্সে অগস্ত কোঁৎ-এর 'দৃষ্টবাদ' (Positivism) -এর প্রভাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় প্রকৃতিবিজ্ঞানের পদ্ধতির ব্যবহার হতে শুরু করে। এই ধারার প্রবণতা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 'আচরণবাদ' (Behaviouralism)-এর উদ্ভব হয়।

অধ্যাপক অ্যালান বল বলেছেন ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের আগে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় দর্শন (Philosophy), ইতিহাস (History) ও আইনের (Law) প্রাধান্য ছিল। ১৯০৮ সালে গ্রাহাম ওয়ালাস-এর *Human Nature in Politics* এবং আর্থার বেন্টলির *The Process of Government* বই দুটি প্রকাশের পর রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা খানিকটা বদলায়। রাষ্ট্র, সরকার বা অন্যান্য রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মূল আলোচ্য বিষয় হয়ে ওঠে। হ্যারল্ড ডি. ল্যাসওয়েল

তাঁর *Politics: Who Gets, What, When and How?* পুস্তকে এবং পরবর্তীকালে ল্যাসওয়েল ও কাপলান তাঁদের *Power and Society* পুস্তকে বলেন, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা মূলত প্রভাব এবং প্রভাবশালীদের নিয়ে (The study of politics is the study of influence and the influential)। সাম্প্রতিক কালে ডেভিড ইস্টন প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বলেছেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মূল আলোচ্য হল "যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া" (Collective decision making process)। এই প্রক্রিয়া সমাজের রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে রূপ দেয় যার কাজ "মূল্যের কর্তৃত্বপূর্ণ বরাদ্দ" (authoritative allocation of values)। সাবেকি রাজনীতির রাষ্ট্রকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিকে আচরণবাদীরা মূলত বর্ণনাত্মক প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক এবং নীতিমানবাচক বলে চিহ্নিত করে তাকে পরিহারযোগ্য বলে মনে করেছেন। জোগানের স্বল্পতার কারণেই সমাজের সদস্যদের মধ্যে বিভিন্ন মূল্য বণ্টন করে দিতে হয়।

রাজনীতির ক্ষেত্রটি ব্যাপক। সমাজের প্রায় সকল স্তরেই এর আবির্ভাব ঘটতে পারে। রাজনীতির ক্ষেত্রটি সমাজের সর্বক্ষেত্রে প্রসারিত। এস.এম. লিপসেট (S.M. Lipset) তাঁর *Political Man* গ্রন্থে রাজনীতির সামাজিক ভিত্তি বা Social roots of politics-এর কথা বলেছেন। সমাজের মধ্যে উদ্ভূত দাবিদাওয়া, চাপ ও সমর্থন রাজনৈতিক প্রবাহকে বা রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে থাকে। রাজনৈতিক দল, স্বার্থগোষ্ঠী, জনমত, নির্বাচনী আচরণ, রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে সমাজের মধ্য থেকে উদ্ভূত দাবিদাওয়া, চাপ ও সমর্থন 'input' বা উপকরণ হিসাবে রাজনৈতিক ব্যবস্থার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। তাই রাজনৈতিক পর্যালোচনায় সামাজিক প্রেক্ষাপটটি বিশেষ প্রাসঙ্গিক। কিন্তু রাজনীতি সম্পর্কে এই পরিবর্তিত ধ্যান ধারণার ফলে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ক ধারণার ক্ষেত্রেও পরিবর্তন ঘটেছে। প্রথমত, রাজনীতিকে সমাজতত্ত্বের উপগ্রহ (Satellite of Sociology) হিসাবে দেখা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের স্বাতন্ত্র্য (autonomy) বিনষ্ট হয়েছে।

> Alan R. Ball তাঁর *Modern Politics and Government* গ্রন্থে বলেছেন, "Political activity . . . involves disagreements and the reconciliation of those disagreements and therefore can occur at any level"।
>
> Andrew Heywood বলেছেন, "Politics, in its broadest sense, is the activity through which people make, preserve and amend the general rules under which they live"।

Scanned by CamScanner

বুর্জোয়া তাত্ত্বিকেরা যে দৃষ্টিভঙ্গি থেকে রাজনীতিকে বিচার বিশ্লেষণ করেন, মার্কসবাদীরা সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তার পর্যালোচনা করেছেন। মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে রাজনীতি হল এমন একটি শ্রেণিগত ধারণা, যা ক্ষমতাকে কার্যকর করার কার্যকলাপের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত থাকে। রাজনীতি গঠনের পিছনে অর্থনৈতিক উপাদানের চরম প্রভাব থাকায় লেনিন রাজনীতিকে 'অর্থনীতির ঘনীভূত প্রকাশ' ('concerntrated expressicm of economics') বলে বর্ণনা করেছেন। র‍্যাল্‌ফ্ মিলিব্যান্ড (Ralph Miliband) তাঁর *Marxism and Politics* গ্রন্থে বলেছেন, "মার্কসীয় রাজনীতির তত্ত্বের মূলে আছে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ধারণা।" (At the core of Marxist theory of politics there is the notion of conflict)। বুর্জোয়া তাত্ত্বিকেরাও রাজনীতিকে দেখেছেন দ্বন্দ্ব নিরসনের প্রক্রিয়া হিসেবে। কিন্তু তাঁরা মূলত ব্যক্তি ও গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কথা বলেছেন, মার্কসবাদ শ্রেণিদ্বন্দ্বের কথা বলেছে। তাই অমার্কসীয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের বিরোধ সম্পর্কিত ধারণার সঙ্গে মার্কসীয় দর্শনের পার্থক্য রয়েছে।

> The term 'political' refers both to power and to values, somtimes together and at other times separately. – Rajeev Bhargava

রাজনীতির সম্পর্কে অন্যতম আধুনিক ধারণা হল নারীবাদী (Feminist) ধারণা। নারীবাদীরা রাজনৈতিক চিন্তার মূলস্রোতকে পুরুষতান্ত্রিক (Mainstream politics is malestream) বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাঁদের মতে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যক্তিগত ক্ষেত্রকে (যেমন পরিবার) রাজনীতির বাইরে রেখে কার্যত রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণের বিরোধিতা করেছে এবং নারীকে গৃহের সামগ্রী হিসেবে গণ্য করেছে। তাই র‍্যাডিকাল নারীবাদীরা রাজনীতির পরিধিকে ব্যক্তিগত তথা পারিবারিক ক্ষেত্র পর্যন্ত প্রসারিত করতে চেয়েছেন। দ্বিতীয় তরঙ্গের নারীবাদের (Second wave of feminism) একটি প্রধান শ্লোগান ছিল, "The personal is political"। নারীবাদী আন্দোলন মূলস্রোতের রাজনৈতিক চিন্তাকে চ্যালেঞ্জ জানায়।

'রাজনীতি'কে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে অধ্যাপক অ্যান্ড্রু হেউড (Andrew Heywood) দুটি দৃষ্টিভঙ্গি প্রত্যক্ষ করেছেন। প্রথমত, একটি ক্ষেত্র বা এলাকা হিসেবে রাজনীতিকে দেখা— Politics as an arena— যেমন জনপরিসর বা এলাকা যে ক্ষেত্রে রাজনৈতিক কার্যকলাপ সংঘটিত হয়। দ্বিতীয়ত, রাজনীতিকে একটি পদ্ধতি বা কৌশল বা পন্থা হিসেবে দেখা— যে ক্ষেত্রে রাজনৈতিক আচরণের বিশেষ কতকগুলি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। Heywood কে অনুসরণ করে বিষয়টি নিম্নলিখিত রেখাচিত্রের মাধ্যমে

তুলে ধরা যেতে পারে:

	একটি ক্ষেত্র বা এলাকা হিসেবে রাজনীতি (Politics as an arena)	পদ্ধতি বা পন্থা হিসেবে রাজনীতি (Politics as a process)
রাজনীতির সংজ্ঞা	• সরকার পরিচালনার কৌশল জনপরিসর হিসেবে রাজনীতি	• সমঝোতা ও সহমত • ক্ষমতা ও সম্পদের বন্টন
রাজনীতি পাঠের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি	• আচরণবাদ • যুক্তিবাদী পছন্দের তত্ত্ব • প্রাতিষ্ঠানিকতাবাদ	• নারীবাদ • মার্কসবাদ • উত্তর-দৃষ্টবাদী (Post-Positivist) দৃষ্টিভঙ্গি

রাজনীতিকে সংজ্ঞায়িত করার প্রচেষ্টা— গ্রন্থসূত্র: Andrew Heywood: *Politics*

হেউড রাজনীতিকে সংজ্ঞায়িত করার ক্ষেত্রে চার ধরনের প্রচেষ্টা লক্ষ করেছেন। এগুলি হল:

১। সরকার পরিচালনার কৌশল হিসেবে রাজনীতি (Politics as the art of Government)
২। জনপরিসর-এর বিষয় হিসেবে রাজনীতি (Politics as public affairs)
৩। সমঝোতা ও সহমত হিসেবে রাজনীতি (Politics as compromise and consensus)
৪। ক্ষমতা হিসেবে রাজনীতি (Politics as power)

১। সরকার পরিচালনার কৌশল হিসেবে রাজনীতি (Politics as the art of Government)

জার্মান চ্যান্সেলর বিসমার্ক একদা বলেছিলেন যে রাজনীতি একটি বিজ্ঞান নয়; এটি একটি কলা। বিসমার্ক আসলে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে রাজনীতি হল সরকার পরিচালনার কৌশল যার দ্বারা যৌথ সিদ্ধান্ত কার্যকরী করা হয়। রাজনীতির ধ্রুপদী সংজ্ঞাও খানিকটা এই রকম। গ্রিক পলিস (Polis) বা নগররাষ্ট্র থেকে ইংরাজি 'Politics' কথাটি এসেছে। প্রাচীন গ্রিসে সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী নগররাষ্ট্র ছিল এথেন্স— সেখানে 'পলিটিক্স' বলতে বোঝাত 'পোলিস' সংক্রান্ত বিষয়— এই 'পোলিস' ছিল সর্বাপেক্ষা বাঞ্ছনীয় ও চূড়ান্ত সংগঠন। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিভাষায় রাজনীতি হল রাষ্ট্র সংক্রান্ত বিষয়। "Politics is what

Scanned by CamScanner

takes place within a polity"— অ্যারিস্টটল আবার Polity বলতে বুঝিয়েছেন সকলের স্বার্থে পরিচালিত সংখ্যাগরিষ্ঠের নিয়মতান্ত্রিক শাসন। মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ডেভিড ইস্টন তাঁর *The Political System* গ্রন্থে রাষ্ট্র বা State কথাটি বর্জন করলেও রাজনীতি বলতে বুঝিয়েছেন এমন একটি প্রক্রিয়া যার দ্বারা রাজনৈতিক ব্যবস্থা সমাজে সম্পদের বা মূল্যের কর্তৃত্বপূর্ণ বণ্টন করে (authoritative allocation of values)। অর্থাৎ এখানেও প্রকারান্তরে সরকার পরিচালনা করার কথাটা চলে এল। হে'উড-এর মতে এই ধরনের সংজ্ঞার সমস্যা হল এখানে রাজনীতিকে একটি 'State-bound activity' বা রাষ্ট্রকেন্দ্রিক কার্যাবলি রূপে দেখা হয়েছে। এবং এর ফলে রাজনীতির সংজ্ঞা সীমিত বা সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে। আজকে বিশ্বায়ন ও তথ্যপ্রযুক্তির বিপ্লবের যুগে রাজনীতিকে একটি রাষ্ট্রকেন্দ্রিক বিষয়রূপে ভাবলে অনেক অ-রাষ্ট্রীয় বিষয়কে 'non-political elements' বা অ-রাজনৈতিক উপাদান হিসেবে দেখা হয়। তাছাড়া রাজনীতিকে রাষ্ট্রকেন্দ্রিক বিষয় হিসেবে দেখলে আর একটা সমস্যারও সৃষ্টি হয়— রাজনীতি যেন একটা নিন্দনীয় ব্যাপার। মেকিয়াভেলি 'দ্য প্রিন্স' গ্রন্থ লেখার পর থেকে আজ পর্যন্ত ছল-চাতুরির সমর্থক হিসেবে অকারণ নিন্দিত হয়ে আসছেন।

২। গণ বা জনপরিসর-সংক্রান্ত বিষয় হিসেবে রাজনীতি (Politics as Public Affairs)

রাজনীতির প্রকৃতি সম্পর্কে দ্বিতীয় এবং অপেক্ষাকৃত ব্যাপক ধারণা হল রাজনীতিকে জন বা গণপরিসর সংক্রান্ত জীবন হিসেবে চিহ্নিত করা। হেউড-এর মতে এই ধারণার উৎস খুঁজে পাই আমরা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনকরূপে পরিচিত প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটলের *Politics* গ্রন্থে। তিনি বলেছিলেন যে মানুষ স্বভাবজাত ভাবেই রাজনৈতিক জীব (Man is by nature a political animal) অর্থাৎ একটি সুষ্ঠু রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের মধ্যেই মানুষের সঠিক বিকাশ তথা 'সুন্দর জীবন' (good life) কার্যকর করা সম্ভব। একটি ন্যায়-নির্ভর সমাজ গড়ে তোলার জন্য রাজনীতি একটি অতি আবশ্যিক নৈতিক ক্রিয়া; তাই অ্যারিস্টটলের কাছে রাজনীতি ছিল 'master science'।

কিন্তু এখন সমস্যা হল 'জন জীবন' (public life) এবং ব্যক্তিগত জীবন (private life)-এর মধ্যে পার্থক্য করা হবে কী করে? রাষ্ট্রবিজ্ঞানে একটি অতি দীর্ঘ ঐতিহ্য আছে রাষ্ট্র (state) এবং পৌর বা নাগরিক সমাজ (civil society)-এর মধ্যে পার্থক্য করা। কোনো রকম বিতর্কের মধ্যে না গিয়ে বলা যায় পৌর সমাজ হল রাষ্ট্রীয় এলাকা বা খরবদারির বাইরে মানুষের স্বাধীন সংঘবদ্ধ জীবন (free associational life of the individual outside state purview)। এই দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যক্তি মানুষ তার জীবনের যে দিকগুলি নিজেই সামলাতে পারে যথা পারিবারিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, নৈতিক ইত্যাদি ক্ষেত্র— সেখানে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ অপ্রয়োজনীয়। এখানে ম্যাকাইভার (MacIver)-এর বিখ্যাত মন্তব্য স্মরণীয়। তিনি বলেছেন একটি পেনসিল কাটার জন্য কুঠার যেমন অপ্রয়োজনীয় সেরূপ মানুষের অন্তর্জীবনের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলির নিয়ন্ত্রণে রাষ্ট্রের কোনো ভূমিকা থাকতে পারে না। অবশ্য বহুত্ববাদী (pluralist)-দের এই মত সকলে মেনে নেন না। নারীবাদী মতাদর্শের দ্বিতীয় তরঙ্গে একটি বিখ্যাত স্লোগান ছিল 'The Personal is Political'— অর্থাৎ ব্যক্তি জগতও যে রাজনীতির আঙিনায় পড়ে তার ওপর নারীবাদীরা জোর দিয়েছিলেন। উদারনীতিবাদের প্রবক্তারা প্রধানত রাষ্ট্র অপেক্ষা ব্যক্তি জীবন ও পৌর সমাজের ওপর অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। জন স্টুয়ার্ট মিল ব্যক্তির 'আত্মকেন্দ্রিক' (self-regarding) কাজ এবং 'পরকেন্দ্রিক' (other regarding) কাজের মধ্যে পার্থক্য করে বলেছিলেন যে আত্মকেন্দ্রিক এলাকায় রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ কাম্য নয়।

"Every political scientist plays a double role. He is part scientist and part philosopher . . ." Andrew Hacker, *Political Theory*, 1961.

৩। সমঝোতা ও সহমত হিসেবে রাজনীতি (Politics as Compromise and Consensus)

আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে, রাজনীতি হল সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের অনুশীলন। সমাজে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে সংঘাত যেমন মানব জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ, রাজনৈতিক বিরোধও তেমনি মানব সমাজের অপরিহার্য অঙ্গ। হিংসার পথ পরিহার করে এই বিরোধের নিষ্পত্তির প্রক্রিয়াকে রাজনীতি বলা হয়। অ্যালান বল-এর মতে রাজনীতি হল একটি ক্রিয়াকলাপ যা সমাজের যে কোনো স্তরেই সংঘটিত হতে পারে। রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ বলতে তিনি মূলত বিরোধ ও তার মীমাংসা প্রক্রিয়াকে বুঝিয়েছেন। বার্নার্ড ক্রিক (Bernard Crick)-ও তাঁর *In Defence of Politics* গ্রন্থে বলেছেন সমাজে বিভিন্ন স্বার্থের মধ্যে সংহতিসাধন— প্রত্যেক গোষ্ঠীকে তার গুরুত্ব অনুযায়ী ক্ষমতায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেবার ব্যবস্থাই হল রাজনীতি। তাঁর ভাষায় "Politics [is] the activity by which differing interests within a given unit of rule are conciliated by giving them a share in power in proportion to their importance to the welfare and the survival of the whole community."

রাজনীতি হল সেই বিষয় যা সমাজস্থ মানুষের বিরোধ এবং বিরোধের নিষ্পত্তি, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব সম্পর্কিত কার্যাবলি নিয়ে আলোচনা করে। হেউড-এর মতে রাজনীতিতে সহমতেরও (Consensus) একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে। পশ্চিমী উদারনৈতিক গণতন্ত্রে সহমত একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। হে'উড-এর

Scanned by CamScanner

takes place within a polity"— অ্যারিস্টটল আবার Polity বলতে বুঝিয়েছেন সকলের স্বার্থে পরিচালিত সংখ্যাগরিষ্ঠের নিয়মতান্ত্রিক শাসন। মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ডেভিড ইস্টন তাঁর *The Political System* গ্রন্থে রাষ্ট্র বা State কথাটি বর্জন করলেও রাজনীতি বলতে বুঝিয়েছেন এমন একটি প্রক্রিয়া যার দ্বারা রাজনৈতিক ব্যবস্থা সমাজে সম্পদের বা মূল্যের কর্তৃত্বপূর্ণ বণ্টন করে (authoritative allocation of values)। অর্থাৎ এখানেও প্রকারান্তরে সরকার পরিচালনা করার কথাটা চলে এল। হে'উড-এর মতে এই ধরনের সংজ্ঞার সমস্যা হল এখানে রাজনীতিকে একটি 'State-bound activity' বা রাষ্ট্রকেন্দ্রিক কার্যাবলি রূপে দেখা হয়েছে। এবং এর ফলে রাজনীতির সংজ্ঞা সীমিত বা সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে। আজকে বিশ্বায়ন ও তথ্যপ্রযুক্তির বিপ্লবের যুগে রাজনীতিকে একটি রাষ্ট্রকেন্দ্রিক বিষয়রূপে ভাবলে অনেক অ-রাষ্ট্রীয় বিষয়কে 'non-political elements' বা অ-রাজনৈতিক উপাদান হিসেবে দেখা হয়। তাছাড়া রাজনীতিকে রাষ্ট্রকেন্দ্রিক বিষয় হিসেবে দেখলে আর একটা সমস্যারও সৃষ্টি হয়— রাজনীতি যেন একটা নিন্দনীয় ব্যাপার। মেকিয়াভেলি 'দ্য প্রিন্স' গ্রন্থ লেখার পর থেকে আজ পর্যন্ত ছল-চাতুরির সমর্থক হিসেবে অকারণ নিন্দিত হয়ে আসছেন।

২। গণ বা জনপরিসর-সংক্রান্ত বিষয় হিসেবে রাজনীতি (Politics as Public Affairs)

রাজনীতির প্রকৃতি সম্পর্কে দ্বিতীয় এবং অপেক্ষাকৃত ব্যাপক ধারণা হল রাজনীতিকে জন বা গণপরিসর সংক্রান্ত জীবন হিসেবে চিহ্নিত করা। হেউড-এর মতে এই ধারণার উৎস খুঁজে পাই আমরা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনকরূপে পরিচিত প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটলের *Politics* গ্রন্থে। তিনি বলেছিলেন যে মানুষ স্বভাবজাত ভাবেই রাজনৈতিক জীব (Man is by nature a political animal) অর্থাৎ একটি সুষ্ঠু রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের মধ্যেই মানুষের সঠিক বিকাশ তথা 'সুন্দর জীবন' (good life) কার্যকর করা সম্ভব। একটি ন্যায়-নির্ভর সমাজ গড়ে তোলার জন্য রাজনীতি একটি অতি আবশ্যিক নৈতিক ক্রিয়া; তাই অ্যারিস্টটলের কাছে রাজনীতি ছিল 'master science'।

কিন্তু এখন সমস্যা হল 'জন জীবন' (public life) এবং ব্যক্তিগত জীবন (private life)-এর মধ্যে পার্থক্য করা হবে কী করে? রাষ্ট্রবিজ্ঞানে একটি অতি দীর্ঘ ঐতিহ্য আছে রাষ্ট্র (state) এবং পৌর বা নাগরিক সমাজ (civil society)-এর মধ্যে পার্থক্য করা। কোনো রকম বিতর্কের মধ্যে না গিয়ে বলা যায় পৌর সমাজ হল রাষ্ট্রীয় এলাকা বা খবরদারির বাইরে মানুষের স্বাধীন সংঘবদ্ধ জীবন (free associational life of the individual outside state purview)। এই দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যক্তি মানুষ তার জীবনের যে দিকগুলি নিজেই সামলাতে পারে যথা পারিবারিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, নৈতিক ইত্যাদি ক্ষেত্র— সেখানে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ অপ্রয়োজনীয়। এখানে ম্যাকাইভার (MacIver)-এর বিখ্যাত মন্তব্য স্মরণীয়। তিনি বলেছেন একটি পেনসিল কাটার জন্য কুঠার যেমন অপ্রয়োজনীয় সেরূপ মানুষের অন্তর্জীবনের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলির নিয়ন্ত্রণে রাষ্ট্রের কোনো ভূমিকা থাকতে পারে না। অবশ্য বহুত্ববাদী (pluralist)-দের এই মত সকলে মেনে নেন না। নারীবাদী মতাদর্শের দ্বিতীয় তরঙ্গে একটি বিখ্যাত স্লোগান ছিল 'The Personal is Political'— অর্থাৎ ব্যক্তি জগতও যে রাজনীতির আঙিনায় পড়ে তার ওপর নারীবাদীরা জোর দিয়েছিলেন। উদারনীতিবাদের প্রবক্তারা প্রধানত রাষ্ট্র অপেক্ষা ব্যক্তি জীবন ও পৌর সমাজের ওপর অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। জন স্টুয়ার্ট মিল ব্যক্তির 'আত্মকেন্দ্রিক' (self-regarding) কাজ এবং 'পরকেন্দ্রিক' (other regarding) কাজের মধ্যে পার্থক্য করে বলেছিলেন যে আত্মকেন্দ্রিক এলাকায় রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ কাম্য নয়।

"Every political scientist plays a double role. He is part scientist and part philosopher . . ." Andrew Hacker, *Political Theory*, 1961.

৩। সমঝোতা ও সহমত হিসেবে রাজনীতি (Politics as Compromise and Consensus)

আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে, রাজনীতি হল সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের অনুশীলন। সমাজে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে সংঘাত যেমন মানব জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ, রাজনৈতিক বিরোধও তেমনি মানব সমাজের অপরিহার্য অঙ্গ। হিংসার পথ পরিহার করে এই বিরোধের নিষ্পত্তির প্রক্রিয়াকে রাজনীতি বলা হয়। অ্যালান বল-এর মতে রাজনীতি হল একটি ক্রিয়াকলাপ যা সমাজের যে কোনো স্তরেই সংঘটিত হতে পারে। রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ বলতে তিনি মূলত বিরোধ ও তার মীমাংসা প্রক্রিয়াকে বুঝিয়েছেন। বার্নার্ড ক্রিক (Bernard Crick)-ও তাঁর *In Defence of Politics* গ্রন্থে বলেছেন সমাজে বিভিন্ন স্বার্থের মধ্যে সংহতিসাধন— প্রত্যেক গোষ্ঠীকে তার গুরুত্ব অনুযায়ী ক্ষমতায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেবার ব্যবস্থাই হল রাজনীতি। তাঁর ভাষায় "Politics [is] the activity by which differing interests within a given unit of rule are conciliated by giving them a share in power in proportion to their importance to the welfare and the survival of the whole community."

রাজনীতি হল সেই বিষয় যা সমাজস্থ মানুষের বিরোধ এবং বিরোধের নিষ্পত্তি, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব সম্পর্কিত কার্যাবলি নিয়ে আলোচনা করে। হেউড-এর মতে রাজনীতিতে সহমতেরও (Consensus) একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে। পশ্চিমী উদারনৈতিক গণতন্ত্রে সহমত একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। হে'উড-এর

Scanned by CamScanner

মতে এই সহমত দু ধরনের— (১) পদ্ধতিগত সহমত (Procedural Consensus)— অর্থাৎ কী উপায়ে সিদ্ধান্তে আসতে হবে তা নিয়ে ঐকমত্য এবং (২) বিষয়গত সহমত (Substantive Consensus)— নীতি বা লক্ষ্য নিয়ে সহমত।

৪। ক্ষমতা হিসেবে রাজনীতি (Politics as Power)

এই সংজ্ঞা অনুযায়ী রাজনীতির কেন্দ্রীয় ধারণা হল ক্ষমতা। অ্যালান বল বলেছেন, "Power is a key concept in the study of politics"। অর্থাৎ রাজনীতির মৌলিক ধারণা হল ক্ষমতা। তবে রাজনৈতিক ক্ষমতা কাকে বলে এ নিয়ে মতপার্থক্য আছে। Andrew Heywood ক্ষমতার তিনটি দিকের কথা (Three faces of power) উল্লেখ করেছেন। এগুলি হল:

ক) নীতি নির্ধারণের কর্তৃত্ব হিসেবে ক্ষমতা (Power as decision-making) — রবার্ট ডাল (Robert Dahl), কিথ বোল্ডিং (Keith Boulding) প্রমুখ লেখক ক্ষমতাকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা নীতি নির্ধারণের কর্তৃত্ব হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছেন।

খ) আলোচ্য বিষয় নির্ধারণ করার শক্তি রূপে ক্ষমতা (Power as agenda setting)— Bachrach ও Baratz বলেছেন কোনো বিষয়কে বিতর্ক থেকে সরিয়ে রাখা বা সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে না দেওয়া ক্ষমতার এক ধরনের বহিঃপ্রকাশ, যেমন শক্তিশালী ব্যবসায়িক গোষ্ঠীগুলি ক্রেতা সুরক্ষা সংক্রান্ত আইন পাস হওয়া বন্ধ করে দিতে পারে। এক কথায় 'Agenda-setting' হল কোনো বিতর্কিত বিষয়কে জনপরিসরের আলোচনাক্ষেত্র থেকে সরিয়ে রাখার ক্ষমতা।

গ) চিন্তা বা মনন প্রক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ হিসেবে ক্ষমতা (Power as thought control)— প্রচারমাধ্যম বা মনস্তাত্ত্বিক কৌশলের দ্বারা অন্যের মন ও চিন্তাকে নিয়ন্ত্রণ করা ক্ষমতার আর একটি দিক। S. Lukes তাঁর *Power: A Radical View* গ্রন্থে বলেছেন যে 'Power is essentially a contested concept' অর্থাৎ ক্ষমতা একটি বিতর্কিত ধারণা। তবে ক্ষমতার সর্বাধিক প্রচলিত সংজ্ঞাটি রবার্ট ডালের দেওয়া। তাঁর মতে, "A has power over B to the extent that A can get B to do something which B would not otherwise do"। অর্থাৎ A-এর B-এর ওপর ক্ষমতা আছে বুঝতে হবে যদি A B-এর অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে দিয়ে নিজের অভিপ্রেত কাজটি করিয়ে নিতে পারে। নারীবাদী লেখিকা কেট মিলেট তাঁর *Sexual Politics* (১৯৬৯) গ্রন্থে রাজনীতির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, "Power-structured relationships, arrangements whereby one group of persons is controlled by another." অর্থাৎ রাজনীতি হল নারীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে একটি ক্ষমতা-নির্ভর সম্পর্ক যার দ্বারা এক গোষ্ঠী অন্য গোষ্ঠীকে নিয়ন্ত্রণ করে; সহজ করে বললে তিনি পুরুষতন্ত্র বা Patriarchy-কে আক্রমণ করেছেন যা নারীদের অবদমিত করে রাখে। অন্যদিকে মার্কস ও এঙ্গেলস্ তাঁদের The Communist Manifesto-তে ক্ষমতা বলতে বুঝিয়েছেন "The organized power of one class for oppressing another" অর্থাৎ এক শ্রেণিকে শোষণ করার জন্য অন্য শ্রেণির হাতে কেন্দ্রীভূত সংগঠিত শক্তি। আবার অন্যত্র মার্কস রাজনীতিকে উপরিকাঠামো বা Super structure-এর অংশ হিসেবে দেখেছেন যার ভিত্তি (Base) হল উৎপাদন ব্যবস্থা। মার্কসবাদীদের মতে, রাজনীতির প্রকৃতি নির্ধারিত হয় সমাজে প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দ্বারা। লেনিন তাই বলেছেন, রাজনীতি হল "অর্থনীতির ঘনীভূত প্রকাশ" (Politics is concentrated expression of economics)। তবে মার্কসবাদীরা রাজনীতিকে কোনো চিরন্তন বিষয় বলে মনে করেন না। তাঁদের মতে, সমাজ বিবর্তনের শেষ পর্যায়ে শ্রেণিহীন শোষণহীন 'সাম্যবাদী' সমাজ গঠিত হলে রাষ্ট্র ক্রমশ বিলুপ্ত হবে (The state will wither away) এবং সেই অর্থে রাজনীতিরও অবসান ঘটবে। রাজনৈতিক ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব সম্পর্কে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায় জার্মান সমাজতাত্ত্বিক ম্যাক্স ওয়েবার (Max Weber)-এর এ সম্পর্কে অভিমত পর্যালোচনা না করলে। কর্তৃত্ব বা authority-র ওপর ওয়েবার বিশেষ জোর দিয়েছেন। তাঁর মতে, কর্তৃত্ব হল বৈধ ক্ষমতা (legitimate power)। কর্তৃত্বকে তিনি রাজনৈতিক সংগঠনের প্রধান বৈশিষ্ট্য বলে চিহ্নিত করেছেন। ওয়েবার তিন ধরনের কর্তৃত্বের কথা বলেছেন: (১) সাবেকি কর্তৃত্ব (Traditional Authority), (২) গণমোহিনী কর্তৃত্ব (Charismatic Authority) এবং (৩) আইনগত কর্তৃত্ব (Legal Authority)।

> The Study of politics is the study of influence and the influential. – Harold D. Lasswell in *Politics: Who Gets, What, When and How.*

এ প্রসঙ্গে রাজীব ভার্গবের বক্তব্য বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, "... the term 'political' has no fixed or unique meaning. It has multiple, though related meanings." অর্থাৎ 'রাজনৈতিক' কথাটির কোনো স্থির বা অনন্য অর্থ নেই। এর একাধিক অর্থ রয়েছে— যদিও এই অর্থগুলি পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত। ভার্গব 'রাজনৈতিক' (Political) কথাটির চার ধরনের অর্থের কথা বলেছেন:

- জনসম্প্রদায়ের কল্যাণের স্বার্থে যৌথভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষমতা
- নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থ সুরক্ষিত কথার জন্য বা অন্য কোনো দুর্বল গোষ্ঠীকে অবদমিত করে রাখার জন্য কোনো কোনো শক্তিশালী গোষ্ঠীর সামর্থ্য।

Scanned by CamScanner

- সামাজিক কল্যাণের স্বার্থে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা
- অন্য গোষ্ঠীকে প্রভাবিত করার জন্য রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বকে ব্যবহার করা।

মনে হতে পারে এই চারটি অর্থ পরস্পর বিরোধী— একই সঙ্গে আমরা কী করে বলতে পারি যে সামগ্রিক কল্যাণের জন্য যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া হল রাজনীতি আবার সংকীর্ণ স্বার্থ রক্ষার জন্য রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বকে ব্যবহার করা হল রাজনীতি। আপাতদৃষ্টিতে দুটি অর্থ পরস্পর বিরোধী বলে মনে হয়। কিন্তু তা নয়— এক্ষেত্রে emperical বা অভিজ্ঞতাবাদী এবং normative বা নীতিমানবাচক দৃষ্টিকোণের মধ্যে পার্থক্য ঘটেছে। অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে 'কী হয়' সেই প্রশ্নের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়, অন্যদিকে নীতিমানবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে 'কী হওয়া উচিত'— এই প্রশ্নটি প্রাধান্য পায়। উপরিউক্ত চারটি অর্থ ছাড়াও ভার্গব বলেছেন, আর একটি অর্থে 'রাজনীতি' কথাটিকে ব্যবহার করা হয়— সেটি হল সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ তথা বিশ্ব কল্যাণের স্বার্থে সিদ্ধান্ত গ্রহণ। তিনি বলেছেন, "... today, we use the term 'political' in each of the five senses and as both an empirical and a normative concept." (*Political Theory: An Introduction* edited by Rajeev Bhargava and Ashok Acharya)

রাজনীতি সম্পর্কে উত্তর আধুনিক দৃষ্টিকোণটি সম্পূর্ণ পৃথক। লিওতার (Lyotard)-এর ভাষায় উত্তর আধুনিকতার মূল কথা হল "incredulity towards metanarratives" অর্থাৎ মহা-আখ্যানের প্রতি অবিশ্বাস। পাশ্চাত্য আধুনিকতা বললেই আমাদের মনে যে যুক্তিসিদ্ধ, বিজ্ঞানসমৃদ্ধ, প্রযুক্তিভিত্তিক, জ্ঞানদীপ্ত রূপটি ভেসে ওঠে, তাকেই প্রশ্ন করে উত্তর আধুনিকতা (Post modernism)। ফুকো, দেরিদা, লিওতার, বদ্রিয়ার প্রমুখ উত্তর আধুনিক লেখক দেখালেন ক্ষমতার ব্যাপক, অদৃশ্য, সুগভীর, জটিল অন্তর্ভেদী তন্ত্রজালকে। উত্তরাধুনিক মতে বিশুদ্ধ যুক্তি বলে কিছু নেই। যুক্তি অনেক রকম, সত্যের ধারণাও বহু। কোনটা প্রভুত্ব করবে সেটা ঠিক হয় ক্ষমতার দ্বারা। অধ্যাপক প্রদীপ বসুর ভাষায়, "জ্ঞানতত্ত্বের একেবারে গোড়ার কথাটাই হল ক্ষমতার লড়াই, অর্থাৎ রাজনীতি।" বলা হয়েছে, "Post modernism is generally defined by an attitude of skepticism, irony or rejection toward the metanarratives and ideologies of modernism, often calling into question various assumptions of Enlightenment rationality." নরহরি কবিরাজ তাঁর "কাকে বলে উত্তরাধুনিকতাবাদ?" পুস্তিকায় বলেছেন, "উত্তর আধুনিকতাবাদীগণ এক থেকে বহু, অভিন্ন থেকে ভিন্ন, একই ছাঁচের নয়, অন্য ছাঁচের এক নতুন জগৎ গড়ে তুলতে চান। সর্বজনীনতাকে চির বিদায়। কারণ সর্বজনীন হচ্ছে দমনমূলক।... বিচ্ছিন্নতা, আকস্মিকতা

ও আপাত বিরোধিতাই হল উত্তর আধুনিক সমাজের পরিচয় চিহ্ন। ঐতিহাসিক মহাকথনে আর আমাদের ফিরে যাবার পথ নেই, সংক্ষিপ্ত ইতিহাসই একমাত্র বিকল্প।"

রাজনীতি চর্চার ক্ষেত্রে আর একটি নতুন ধারা হল উত্তর-উপনিবেশবাদ বা Post-colonialism। ঔপনিবেশিক অভিজ্ঞতা কীভাবে উত্তর-ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার ওপর প্রভাব ফেলে উত্তর-উপনিবেশবাদ তা নিয়ে আলোচনা করে। উত্তর-উপনিবেশবাদ তৃতীয় বিশ্বের সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দুর্বল দেশগুলির দুর্দশা ও শোষণকে পশ্চিমী ঔপনিবেশিক শক্তির চোখ দিয়ে না দেখে নিজস্ব দেশীয় সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে চায়। ১৯৭৮ সালে প্রকাশিত এডওয়ার্ড সঈদ-এর *Orientalism*-এ বলা হয়েছে, "প্রাচ্যবাদ একটা বর্গনাম যা আমি প্রাচ্যের প্রতি পশ্চিমের মনোভাব বর্ণনা করার জন্য ব্যবহার করেছি।" তাঁর মতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে সম্পর্কই হল ক্ষমতা, আধিপত্য ও বিভিন্ন মাত্রার জটিল কর্তৃত্বের সম্পর্ক।

ওপরের আলোচনা থেকে একথা পরিষ্কার 'রাজনীতি'র কোনো সর্বজনগ্রাহ্য একটি মাত্র সংজ্ঞা নেই। যুগের প্রয়োজনে তার অর্থের সংকোচন বা প্রসারণ ঘটেছে। একথা ঠিক একবিংশ শতাব্দীতে আমরা অধ্যাপক গার্নারের মতো বলতে পারব না যে 'রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শুরু ও শেষ রাষ্ট্রকে দিয়ে' (Political Science begins and ends with state) অথবা অধ্যাপক গেটেলের সঙ্গেও একমত হতে পারব না এই বলে যে "রাষ্ট্রবিজ্ঞান হল রাষ্ট্র কী হয়েছে তার ঐতিহাসিক অনুসন্ধান, রাষ্ট্র কী তার বিশ্লেষণমূলক আলোচনা এবং রাষ্ট্রের কী হওয়া উচিত তার রাজনৈতিক ও নীতিগত আলোচনা" ("Political Science is a historical investigation of what the state has been, an analytical study of what the state is and a politico-ethical discussion of what the state should be.")। আধুনিক লেখকেরা রাষ্ট্রের প্রাতিষ্ঠানিকতার ঘেরাটোপে রাজনীতিকে সীমাবদ্ধ রাখতে চান না— বৃহত্তর সামাজিক প্রেক্ষাপটে তাঁরা রাজনীতির অর্থ অনুসন্ধান করেন। কিন্তু তা হলেও রাষ্ট্রকে পরিহার করে রাজনীতির আলোচনার অবকাশ নেই। বহু যুগ ধরেই রাষ্ট্র রাজনীতির কেন্দ্রে অবস্থিত। অধ্যাপক হ্যারল্ড ল্যাস্কি তাঁর *A Grammar of Politcs* গ্রন্থে যথার্থই বলেছেন, "সংগঠিত রাষ্ট্রের পরিপ্রেক্ষিতে মানবজীবনের আলোচনাই রাষ্ট্রবিজ্ঞান।" ("Political Science concerns itself with the life of men in relation to organized state.")। তিনি আরও বলেছেন, "আমরা আলোচ্য বিষয় থেকে মানবজীবনকে প্রভাবিত করে এমন কোনো কিছু বাদ দিতে পারি না।" ("We cannot omit from the field of relevant interest whatever may affect that life.")। মানব সমাজ পরিবর্তনশীল। ম্যাকাইভার লিখেছেন "Society is a process, not a product. When the process ceases, the product disappears." রাজনীতির

Scanned by CamScanner

ক্ষেত্রেও সে কথা প্রযোজ্য। একটি গতিশীল বিষয়ের সীমানা নির্ধারণ বা এক কথায় সংজ্ঞায়িত করা সম্ভব নয়। আগে কেবলমাত্র রাষ্ট্রকেন্দ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে রাজনীতিকে সংজ্ঞায়িত করা হত; এখন বৃহত্তর সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে তাকে সংজ্ঞায়িত করা হয়।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিবর্তন

- সমাজবিজ্ঞানের একটি স্বতন্ত্র শাখা হিসাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জন্ম আধুনিককালে, যদিও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনার শুরু প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে। বিশিষ্ট গ্রিক দার্শনিক প্লেটো ও অ্যারিস্টটলকে রাজনীতি আলোচনার পথিকৃৎ বলে মনে করা হয়। ভারতবর্ষেও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে রাজনীতির আলোচনা পাওয়া যায়।
- মধ্যযুগে রাষ্ট্রবিজ্ঞান চর্চায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়নি। ইউরোপীয় নবজাগরণ ও জ্ঞানদীপ্তি (Enlightenment) পর্বে ম্যাকিয়াভেলি, বোদাঁ, হবস, লক্, রুশো, কান্ট, হেগেল, গ্রিন, মার্কস, মিল প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করেন।
- আধুনিককালে আচরণবাদ, উত্তর-আচরণবাদ, উত্তর-আধুনিকতা, উত্তর-উপনিবেশবাদ, নারীবাদী দৃষ্টিকোণ রাজনীতির আলোচনাকে সমৃদ্ধ করেছে।

গ্রন্থসূত্র:

১। Ball, Alan R, *Modern Politics and Government*.
২। Heywood, Andrew, *Politics*.
৩। Minogue, Kenneth, *Politics*.
৪। দাশ, দীপককুমার, *রাজনীতির তত্ত্বকথা* (১)।
৫। Gauba, O.P., *An Introduction to Political Theory*.
৬। ঘোষ, কৃত্তাপ্রিয়, *রাষ্ট্রতত্ত্ব*।
৭। Bhargava, Rajeeva and Acharya, Ashok (eds), *Political Theory*.
৮। সরকার, অশোককুমার, *সংসদ রাষ্ট্রবিজ্ঞান অভিধান*।

দ্বিতীয় অধ্যায়

রাষ্ট্র, জাতি ও সার্বভৌমিকতা (State, Nation and Sovereignty)

জীবনের সর্বস্তরে রাষ্ট্রের ব্যাপক অস্তিত্ব লক্ষ করে Christopher Morris বলেছিলেন, "You may not be interested in the state, but the state is certainly interested in you." জন্ম নিবন্ধীকরণ থেকে শুরু করে রোড লাইসেন্স, পুলিশ, বোর্ডের পরীক্ষা ও সার্টিফিকেট, নির্বাচনী পরিচয়পত্র, পাসপোর্ট প্রভৃতি জীবনের দৈনন্দিন সকল বিষয়ে রাষ্ট্রের অবস্থিতি। অধিকার, স্বাধীনতা, সাম্য, গণতন্ত্র, নির্বাচন ইত্যাদি রাজনৈতিক তত্ত্বের যে কোনো মূল্যবোধ বা ধারণা রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কিত। এ সকল কারণে রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও কার্যাবলি সম্পর্কে আমাদের পরিচয় থাকা দরকার। আধুনিক রাজনৈতিক চিন্তাবিদরা প্রায় সবাই জার্মান সমাজতাত্ত্বিক ম্যাক্স ওয়েবারের সঙ্গে একমত যে রাষ্ট্র এককভাবে বৈধ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে।

সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য: রাষ্ট্র হল রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মূল বিষয়। অথচ এ বিষয়েও বিভিন্ন ধরনের ব্যাখ্যার শেষ নেই। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনকরূপে পরিচিত গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত বহু রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রাষ্ট্র সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। অ্যারিস্টটল বলেছেন, "রাষ্ট্র হল স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবনযাপনের উদ্দেশ্যে সংগঠিত কয়েকটি পরিবার ও গ্রামের সমষ্টি" (The state is a union of families and villages having for its end perfect and self-sufficing life, by which we mean a happy and honourable life.)। অ্যারিস্টটলের মতে কয়েকটি পরিবার ও গ্রামের সমন্বিত রূপই হল রাষ্ট্র। এর উদ্দেশ্য হল আদর্শ ও স্বাবলম্বী জীবন। অবশ্য এখানে স্মরণ রাখা দরকার নগর-রাষ্ট্র বা polis-এর ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে অ্যারিস্টটল রাষ্ট্রের সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসন বলেছেন, "রাষ্ট্র হল আইনানুযায়ী সংগঠিত নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের অধিকারী এক জনসমষ্টি" (A State is a people

Scanned by CamScanner

organized by law within a definite territory.)। তবে বর্তমানে অধ্যাপক গার্নার প্রদত্ত সংজ্ঞাটিই সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। তাঁর মতে, "রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও শাসনতান্ত্রিক আইনের ধারণা অনুসারে রাষ্ট্র হল অল্পবিস্তর বহুসংখ্যক ব্যক্তি নিয়ে গঠিত এমন একটি জনসমাজ যা নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্থায়ীভাবে বসবাস করে, যা বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণ থেকে সম্পূর্ণ বা প্রায়-সম্পূর্ণ মুক্ত এবং যার একটি সুসংগঠিত শাসনব্যবস্থা আছে, যে শাসনব্যবস্থার প্রতি অধিবাসীদের অধিকাংশ স্বভাবগত আনুগত্য প্রদর্শন করে।" (The State, as a concept of Political Science and Public Law is a community of persons more or less numerous, permanently occupying a definite portion of territory, independent or nearly so, of external control and possessing an organised government to which the great body of inhabitants render habitual obedience.)

অধ্যাপক অ্যান্ড্রু হে'উড (Heywood) বলেছেন চার ধরনের দৃষ্টিকোণ থেকে রাষ্ট্রকে পর্যালোচনা করা হয়েছে। এগুলি হল:

- আদর্শবাদী বা ভাববাদী দৃষ্টিকোণ (Idealist Perspective)
- ক্রিয়াবাদী বা কার্যগত দৃষ্টিকোণ (Functionalist Perspective)
- সাংগঠনিক দৃষ্টিকোণ (Organizational Perspective) এবং
- আন্তর্জাতিক দৃষ্টিকোণ (International Perspective)

• **ভাববাদী দৃষ্টিকোণ** (Idealist Perspective): রাষ্ট্রের প্রকৃতি বিচারে ভাববাদী মতবাদটি রাষ্ট্রবিজ্ঞানে নানা নামে পরিচিত। ভাববাদী তত্ত্ব, আদর্শবাদী তত্ত্ব, আধিবিদ্যক তত্ত্ব বা দার্শনিক তত্ত্ব— এরকম বিভিন্ন নামে এটি খ্যাত। ভাববাদী রাষ্ট্রতত্ত্বের চূড়ান্ত রূপ পাওয়া যায় জার্মান দার্শনিক হেগেলের দর্শনে। হেগেল তাঁর ভাববাদী দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া ব্যবহার করে বলেছেন বাদ-প্রতিবাদ-সম্বাদ (Thesis-Anti-thesis-Synthesis)-এর অনুক্রমে সমাজ বিবর্তিত হয়ে চলেছে এবং এক পরম ভাবের (Absolute Idea) চূড়ান্ত লক্ষ্যের দিকে তার গতিমুখ। হেগেলের মতে পরিবার হল বাদ বা 'Thesis'; পৌর সমাজ বা 'Civil Society' হল প্রতিবাদ বা 'Anti-thesis' এবং বাদ-প্রতিবাদের এই দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়ে যে সম্বাদ বা 'Synthesis' তৈরি হয়, হেগেলের মতে, তা হল রাষ্ট্র (State)। সুতরাং রাষ্ট্র হল সর্বজনীন নৈতিকতার অবয়ব। হেগেল বলেছেন, রাষ্ট্র চরম, সর্বশক্তিমান, অভ্রান্ত, ঐশ্বরিক প্রতিষ্ঠান। রাষ্ট্র হল পৃথিবীতে ঈশ্বরের পদক্ষেপ। হেগেলের ভাষায়, "রাষ্ট্র আত্মসচেতন নৈতিক সত্তা এবং আত্মজ্ঞানসম্পন্ন আত্মোপলব্ধিকারী ব্যক্তি।" ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের জন্য তাকে রাষ্ট্রের উপরই নির্ভর করতে হয়। ব্যক্তির কোনো

যুক্তিসঙ্গত অধিকার নেই এই অভ্রান্ত নৈতিক প্রতিষ্ঠানের বিরোধিতা করার। হে'উড বলেছেন, "The drawback of idealism is that it fosters an uncritical reverence for the state ..."।

• **ক্রিয়াবাদী দৃষ্টিকোণ** (Functionalist Perspective): এই দৃষ্টিকোণে রাষ্ট্রের ভূমিকা বা উদ্দেশ্যর ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে রাষ্ট্রের প্রধান কাজ হল সামাজিক ব্যবস্থাকে সুরক্ষিত করা, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা এবং নিরাপত্তা বিধান করা। Neo-Marxist লেখকদের মতে রাষ্ট্র শ্রেণিসংগ্রামকে অবদমিত করে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার কায়েমি স্বার্থকে সুরক্ষিত করে।

• **সাংগঠনিক দৃষ্টিকোণ** (Organizational Perspective): সাংগঠনিক দৃষ্টিকোণ রাষ্ট্রকে সরকার পরিচালনার একটি যন্ত্র (apparatus of government) হিসাবে গণ্য করে। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী সরকারের বিভিন্ন অঙ্গ যথা পুলিশ, সামরিক বাহিনী, আমলাতন্ত্র, বিচারব্যবস্থা, সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা— এক কথায় 'body politic' বলতে যা বোঝায়— তার সংগঠিত ও যৌথ রূপ হল রাষ্ট্র। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে রাষ্ট্র (State) এবং পৌর সমাজ (Civil Society)-এর মধ্যে পার্থক্য করা হয়। রাষ্ট্রীয় গণ্ডির বাইরে ব্যক্তি মানুষের যে স্বাধীন সাংগঠনিক জীবন (free associational life of the individual) সেটিই হল পৌর সমাজ বা Civil Society। হে'উড (Heywood) সাংগঠনিক দৃষ্টিকোণের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন:

› রাষ্ট্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। অন্যান্য সংগঠন ও গোষ্ঠীর ঊর্ধ্বে এর অবস্থান।

› রাষ্ট্র জনপরিসর বা গণপরিসরের (public sphere) অন্তর্গত; ব্যক্তিগত (private) নয়।

› রাষ্ট্র বৈধতা দানের একটি উপায়। Legitimation বা বৈধতা প্রদান করা রাষ্ট্রের একটি কাজ। তাই রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত সকলে মানতে বাধ্য।

› রাষ্ট্র একটি দমনমূলক প্রতিষ্ঠান। হে'উড-এর ভাষায়, "The state is an instrument of domination."

› রাষ্ট্র একটি ভূখণ্ডগত প্রতিষ্ঠান (territorial association)।

• **আন্তর্জাতিক দৃষ্টিকোণ** (International Perspective): আন্তর্জাতিক রাজনীতির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিশ্বব্যবস্থার মৌলিক একক (basic unit) হল রাষ্ট্র। আন্তর্জাতিক আইনে রাষ্ট্রকে একটি 'legal person' হিসেবে দেখা হয়। রাষ্ট্রসংঘের সনদে তাই 'sovereign equality' বা সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলির সমতার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। Montevideo Convention on the Rights and Duties of the State (1933)-এর ১নং ধারায়

Scanned by CamScanner

আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে রাষ্ট্রের চারটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে:

- একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ড
- একটি স্থায়ী জনসমাজ
- একটি কার্যকরী সরকার
- অন্য রাষ্ট্রের সম্পর্ক স্থাপন করার সামর্থ্য

যদিও রাষ্ট্রের সংজ্ঞা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে, তবে আধুনিক রাষ্ট্রের উৎপত্তি নিয়ে মোটামুটি একটা ঐকমত্য আছে। ১৬৪৮ খ্রিস্টাব্দে স্বাক্ষরিত ওয়েস্টফেলিয়া চুক্তির সময় থেকে আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছে বলে ধরা হয়। কিন্তু রাষ্ট্র গঠিত হবার কারণ কী তা নিয়ে রাষ্ট্রচিন্তাবিদদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। চার্লস টিলি (Charles Tilly)-র মতে যুদ্ধ করার ক্ষমতা— একটি সংগঠিত সামরিক বাহিনী— রাষ্ট্রের উদ্ভবের পিছনে একটি বড়ো কারণ। সামরিক খাতে খরচার জন্য কর ব্যবস্থা ও প্রশাসন জরুরি হয়ে পড়ে— এভাবেই রাষ্ট্রের উৎপত্তি। টিলি মন্তব্য করেছেন, "War made the state, and the state made war's", অর্থাৎ যুদ্ধ রাষ্ট্রের সৃষ্টি করে; আবার রাষ্ট্রই যুদ্ধ করে। মার্কসবাদীদের মতে রাষ্ট্রের উদ্ভবের কারণ ভিন্ন। দাস সমাজে ক্রীতদাসদের দমন করার জন্য রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। মার্কস ও এঙ্গেলস-এর মতে রাষ্ট্র হল শ্রেণি শোষণ ও শ্রেণি শাসনের হাতিয়ার। এম. ম্যান (M. Mann) রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে একটি ভিন্ন মডেল তৈরি করেছেন যেটি IEMP Model নামে খ্যাত— এর অর্থ হল ideological অর্থাৎ মতাদর্শগত, Economic বা অর্থনৈতিক, Military বা সামরিক এবং Political বা রাজনৈতিক ক্ষমতার সমন্বয়ে রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। ১৯৪৫ সালে রাষ্ট্রসংঘের যখন সৃষ্টি হয় রাষ্ট্রের সংখ্যা ছিল ৫১; বর্তমানে তা ১৯৩-তে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

রাষ্ট্র সম্পর্কে বিতর্ক ও বিভিন্ন তত্ত্ব

হে'উড বলেছেন, "The State is an 'essentially contested' concept" অর্থাৎ রাষ্ট্র একটি বিতর্কিত ধারণা। রাষ্ট্র সম্পর্কে নানা তত্ত্ব ও মতবাদ রয়েছে। হে'উড চার প্রকারের রাষ্ট্র চিহ্নিত করেছেন। এগুলি হল:

- বহুত্ববাদী রাষ্ট্র (The Pluralist State)
- পুঁজিবাদী রাষ্ট্র (The Capitalist State)
- লেভিয়াথান রাষ্ট্র (The Leviathan State)
- পিতৃতান্ত্রিক রাষ্ট্র (The Patriarchal State)

- **বহুত্ববাদী রাষ্ট্র (The Pluralist State):** উদারনৈতিক ঐতিহ্যধারা থেকেই বহুত্ববাদের জন্ম। বহুত্ববাদী দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী রাষ্ট্র সমাজে আম্পায়ার বা রেফারির কাজ করে। উদারনৈতিক তত্ত্বে রাষ্ট্র বিভিন্ন প্রতিযোগী রাষ্ট্রের মধ্যে নিরপেক্ষ রেফারির কাজ করে। বহুত্ববাদ হল সামগ্রিকতাবাদ (totalitarianism) বিরোধী ও সমষ্টিবাদ (collectivism) বিরোধী মতবাদ। জন লকের মতে রাষ্ট্রের ক্ষমতা জনগণের সম্মতির ওপর নির্ভর করে। লক সীমিত রাষ্ট্রের (limited state) পক্ষপাতী যেখানে ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তির স্বাভাবিক অধিকার সুরক্ষিত থাকবে। আধুনিক বহুত্ববাদীরা যথা রবার্ট ডাল, চার্লস লিন্ডব্লম, জে.কে. গেলব্রেথ স্বীকার করেন যে আধুনিক শিল্পোন্নত রাষ্ট্র অনেক বেশি জটিল। উদারনীতিবাদ ও বহুত্ববাদ স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে ব্যক্তিস্বাধীনতা, আইনের শাসন এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অবাধ প্রতিযোগিতার তত্ত্ব সমর্থন করে। লকের মতে চুক্তির মধ্যে দিয়ে সৃষ্ট রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সর্বোচ্চ ও সার্বভৌম হলেও তা অবাধ নয়।
- **পুঁজিবাদী রাষ্ট্র (The Capitalist State):** রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্কসীয় মতবাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল পুঁজিবাদী বা বুর্জোয়া রাষ্ট্রের ধারণা। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে পুঁজিপতি শ্রেণির উত্থান ও ক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্র ব্যবস্থার উপরও তাদের নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি পেতে থাকে। পুঁজিপতি শ্রেণি তাদের স্বার্থে রাষ্ট্রকে ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে থাকে এবং রাষ্ট্রের ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার দাবি জানাতে থাকে। কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহারে মার্কস ও এঙ্গেলস বলেছেন, "আধুনিক রাষ্ট্রের শাসনমণ্ডলী হল সমগ্র বুর্জোয়া শ্রেণির সাধারণ কাজকর্ম ব্যবস্থাপনার একটি কমিটি মাত্র।" ("The executive of the modern state is but a committee for managing the common affairs of the whole bourgeoise.")। সাধারণভাবে মার্কসীয় রাষ্ট্রতত্ত্বে রাষ্ট্রকে শ্রেণি শাসন ও শ্রেণি শোষণের হাতিয়ার হিসাবে দেখা হয়েছে। কিন্তু মার্কস তাঁর *The Class Struggles in France* এবং *The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte* শীর্ষক রচনায় এই সাধারণ বক্তব্যের ব্যতিক্রম হিসাবে রাষ্ট্রের আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্যের (Relative Autonomy of State) ধারণাকে তুলে ধরেছেন। এরই ফলশ্রুতিতে মার্কসীয় রাষ্ট্রতত্ত্বকে কেন্দ্র করে দুটি ভিন্ন মতবাদের উদ্ভব হয়েছে। এই দুটি মতধারা instrumentalist versus structuralist debate বা যন্ত্রবাদ বনাম অবয়ববাদ বিতর্ক হিসাবে আখ্যায়িত হয়েছে। এই বিতর্কের প্রধান দুই প্রবক্তা হলেন র‍্যালফ মিলিব্যান্ড (Ralph Miliband) এবং নিকো পুলনাৎজাস (Nicos Poulantzas)। মিলিব্যান্ডের মতে পাশ্চাত্যের উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে রাষ্ট্র হল প্রধানত শাসক পুঁজিপতি শ্রেণির নিয়ন্ত্রণাধীন হাতিয়ার। অপরদিকে পুলনাৎজাস-এর মতে, পুঁজিবাদী সমাজে রাষ্ট্র ব্যবস্থা তার গঠনগত বৈশিষ্ট্যের কারণেই এক ধরনের আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্য অর্জন করে। অন্যদিকে আলথুসে (Althusser) রাষ্ট্রের

Scanned by CamScanner

বলপ্রয়োগমূলক যন্ত্র (Repressive State Apparatus) এবং মতাদর্শগত যন্ত্র (Ideological State Apparatus)-এর মধ্যে পার্থক্য করেছেন।

• **লেভিয়াথান রাষ্ট্র (The Leviathan State):** লেভিয়াথান রাষ্ট্র বলতে হে'উড বুঝিয়েছেন এমন রাষ্ট্র যা অপ্রয়োজনীয়ভাবে ব্যক্তি জীবনে হস্তক্ষেপ করে। এটি বহুত্ববাদী ধারণার সম্পূর্ণ বিরোধী। আমলাতন্ত্র এখানে অত্যধিক সক্রিয় ও শক্তিশালী। হে'উড বলেছেন, "In this view, bureaucratic self-interest invariably supports 'big' government and state intervention." রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ ও সরকারের সর্বস্তরে প্রভাব এই প্রকার রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য। 'New Right' চিন্তাবিদরা এই জাতীয় আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে লেভিয়াথান রাষ্ট্র আখ্যা দিয়েছেন। লেভিয়াথান বললেই আমাদের হবসের কথা মনে পড়ে। লেভিয়াথান হল একটি সর্বশক্তিমান জলজন্তু যা অকারণে রাষ্ট্রের সর্বস্তরে নিজের আধিপত্য ও নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে।

• **পিতৃতান্ত্রিক বা পুরুষতান্ত্রিক রাষ্ট্র (The Patriarchal State):** রাষ্ট্রচিন্তার জগতে নারীবাদ বা নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। সুদীর্ঘকাল ধরে গৃহবন্দি জীবনের নাগপাশ থেকে নারীকে মুক্ত করে তাকে সমাজ-আর্থ-রাজনৈতিক মঞ্চে স্বাধীনভাবে আত্মপ্রকাশ করতে দেওয়ার সদর্থক ও সক্রিয় প্রবণতাই নারীবাদ নামে আখ্যায়িত হয়ে থাকে। পিতৃতান্ত্রিক (patriarchy) শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হল 'পিতার শাসন'। কিন্তু নারীবাদী আলোচনায় এটি কিছুটা ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করা হয়। নারীবাদীরা মনে করেন পুরুষতান্ত্রিকতার বৃহত্তম প্রকাশ দেখা দেয় রাষ্ট্রের মধ্যে দিয়ে। রাষ্ট্র তার আইন, আমলাতন্ত্র, পুলিশ, সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনী, বিচারালয় ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে নারীদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে। তবে রাষ্ট্রের প্রকৃতি প্রশ্নে উদারনৈতিক নারীবাদ (liberal feminism) ও বৈপ্লবিক নারীবাদ (radical feminism)-এর অবস্থানের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। উদারনৈতিক নারীবাদ লিঙ্গ সাম্যের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। কিন্তু বৈপ্লবিক নারীবাদ নারী-পুরুষের সম্পর্ককে 'power-structured relationship' রূপে দেখেছে। বৈপ্লবিক নারীবাদ রাষ্ট্র সম্পর্কে একটি সমালোচনামূলক ও নেতিবাচক ধারণা ('a more critical and negative view of the state' – Heywood) পোষণ করে। এককথায় বৈপ্লবিক নারীবাদ মনে করে "the state is run by men, and for men." – Heywood।

রাষ্ট্রের ভূমিকা

রাষ্ট্রের ভূমিকা ও কার্যাবলি নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। হে'উড রাষ্ট্রের ভূমিকা ও কার্যাবলি সংক্রান্ত ছয় ধরনের রাষ্ট্র চিহ্নিত করেছেন। এগুলি হল:

- ন্যূনতম রাষ্ট্র (Minimal State)
- বিকাশ বা উন্নয়নমুখী রাষ্ট্র (Developmental State)
- সামাজিক-গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র (Social-democratic State)
- সমষ্টিবাদী রাষ্ট্র (Collectivist State)
- সর্বনিয়ন্ত্রণবাদী রাষ্ট্র (Totalitarian State)
- ধর্মীয় রাষ্ট্র (Religious State)

• **ন্যূনতম রাষ্ট্র (Minimal State):** এটি রাষ্ট্র সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা। এঁরা রাষ্ট্রকে 'necessary evil' বা প্রয়োজনীয় অমঙ্গল বলে মনে করেন। বর্তমান যুগে ন্যূনতম রাষ্ট্রের প্রধান প্রবক্তারা হলেন নয়া-উদারনীতিবাদী তাত্ত্বিক হায়েক, নোজিক ও ফ্রিড্‌ম্যান। এঁদের মতে রাষ্ট্রের কাজ হল আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে সুরক্ষিত করা। জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি কার্যকর করা রাষ্ট্রের কাজ নয়। এঁরা মুক্ত বাজার অর্থনীতির সমর্থক; রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের নিরোধী। Neo-liberalism-এর প্রবক্তারা চান "roll back the frontiers of the state" অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্র বা এলাকাকে গুটিয়ে আনা বা সংকুচিত করা।

• **বিকাশমুখী রাষ্ট্র (Developmental State):** হে'উড বলেছেন developmental state বলতে সেই ধরনের রাষ্ট্রকে বোঝায় যে রাষ্ট্র পরিকল্পিতভাবে অর্থনীতিতে হস্তক্ষেপ করে ও শিল্পের উন্নয়নের জন্য সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে। উদাহরণ হিসেবে তিনি জাপান ও জার্মানির উল্লেখ করেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর Bank of Japan এবং সে দেশের বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রক (Ministry of International Trade and Industry বা MITI) জাপানের অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। জার্মানিতেও 'Partnership State' বা অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রের ধারণার মাধ্যমে রাষ্ট্র দেশের অর্থনৈতিক বিকাশে সহায়তা করার জন্য বণিক শ্রেণি ও শ্রমিক শ্রেণির উভয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রেখে চলেছে। সম্প্রতি অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের ফলে 'প্রতিযোগিতামূলক রাষ্ট্র' বা Competition State-এর উদ্ভব হয়েছে। পূর্ব এশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি দেশগুলিকে Asian Tiger আখ্যা দেওয়া হয় এবং রপ্তানিভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে তুলেছে।

• **সামাজিক-গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র (Social-democratic State):** অস্ট্রিয়া, সুইডেন প্রভৃতি দেশগুলি যখন সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থনীতি ও সমাজব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করে তখন সেগুলিকে সামাজিক-গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলা হয়। এরা রাষ্ট্রকে 'necessary evil' বলে মনে করে না। বরং রাষ্ট্র সম্পর্কে এদের ধারণা ইতিবাচক বা সদর্থক। এগুলিকে

জনকল্যাণকর রাষ্ট্র বা enabling state-ও বলা হয়। হে'উড কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, "A state that takes primary responsibility for the social welfare of its citizens . . ." অর্থাৎ এই ধরনের রাষ্ট্র নাগরিকদের সামাজিক কল্যাণ সুনিশ্চিত করতে প্রাথমিক দায়িত্ব গ্রহণ করে। এগুলিকে 'enabling state'ও বলা হয় কারণ তারা ব্যক্তির ক্ষমতায়নের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

• **সমষ্টিবাদী রাষ্ট্র (Collectivized State):** পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রভৃতি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এরা সামগ্রিক অর্থনৈতিক জীবনকে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের অধীনে নিয়ে আসে। পরিকল্পিত অর্থনীতি এ জাতীয় রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য। উৎপাদন ব্যবস্থার সামাজিকীকরণ ও ব্যাঙ্ক প্রভৃতি পরিষেবার জাতীয়করণ সমষ্টিবাদী রাষ্ট্রের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সম্পূর্ণ বিপরীত মতাদর্শ এটি। মার্কস-এঙ্গেলস এর লেখার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে এই জাতীয় রাষ্ট্রে 'common ownership over private property'-এর উপর জোর দেওয়া হয়।

• **সর্ব নিয়ন্ত্রণবাদী রাষ্ট্র (Totalitarian State):** রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের সর্বাপেক্ষা চূড়ান্ত নিদর্শন হল এই ধরনের রাষ্ট্র। এখানে রাষ্ট্র শুধু অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে না, শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্ম, পারিবারিক জীবন— মনুষ্য জীবনের প্রায় সর্বক্ষেত্রে রাষ্ট্রের অবস্থিতি লক্ষ করা যায়। হিটলারের জার্মানি বা স্ট্যালিনের সোভিয়েত ইউনিয়ন 'totalitarian' রাষ্ট্রের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এখানে Civil Society বা পৌর সমাজ রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও অধিকারও সীমিত। হে'উড সর্ব নিয়ন্ত্রণবাদকে "an all-encompassing system of political rule" আখ্যা দিয়েছেন।

• **ধর্মীয় রাষ্ট্র (Religious State):** ধর্মকেন্দ্রিক রাষ্ট্র একটি বিশেষ ধর্মকে রাজনৈতিক মতাদর্শ হিসেবে ব্যবহার করে। যেমন পাকিস্তানে ইসলামকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়। শ্রীলঙ্কাতেও বৌদ্ধধর্মকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে তামিল বিচ্ছিন্নতাবাদকে কঠোর ও নির্মমভাবে দমন করা হয়। আফগানিস্তানে তালিবানরা এইরূপ 'theocratic state' বা সংকীর্ণ ধর্মকেন্দ্রিক রাষ্ট্র স্থাপন করতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ধর্মীয় মৌলবাদ হল এ জাতীয় রাষ্ট্রের ভিত্তি। ১৯৭৯ সালে ইরানে ইসলামিক বিপ্লবের পর থেকে এই ধরনের রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে বলে হে'উড মনে করেন।

বিশ্বায়নের যুগে রাষ্ট্র

বিংশ ও একবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অভূতপূর্ব উন্নতির পথ ধরে বিশ্বব্যাপী সংযোগ ব্যবস্থার অভাবনীয় অগ্রগতির ফলে রাষ্ট্রগুলির সার্বভৌমত্বের শ্রেষ্ঠত্ব অনেকটাই হ্রাস পেতে থাকে। রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের এই বিপন্নতাকে ত্বরান্বিত করে বিংশ শতাব্দীর

শেষলগ্নে সংঘটিত বিশ্বায়ন (Globalization) প্রক্রিয়া। সাধারণভাবে বিশ্বায়ন বলতে পৃথিবীব্যাপী কোনো কিছুর সঞ্চরণ ও সম্প্রসারণকে বোঝায়। ফলে বিশ্বব্যাপী যখন সমজাতীয় সংস্কৃতি, ব্যাবসা-বাণিজ্য, রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি সম্প্রসারিত হয় তখন এক 'Borderless world' বা সীমানাহীন বিশ্ব গড়ে ওঠে। বিশ্বব্যাঙ্ক, আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা এবং শক্তিশালী দেশগুলির জোট যথা ন্যাটো, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, জি-এইট প্রভৃতি গোষ্ঠী এবং বহুজাতিক সংস্থাগুলি সারা বিশ্বকে পরিচালনা করছে। তাই দুর্বল রাষ্ট্রগুলির সার্বভৌমত্ব এখন বিপন্ন। এমতাবস্থায় অনেকে 'decline of state' বা রাষ্ট্রের অবনতির কথা বলেছেন। বিশ্বায়নের ফলে পৃথিবী জুড়ে যে পৃথিবীব্যাপী মুক্তবাজার অর্থনীতি (free market economy) গড়ে উঠেছে, তার ফলেও উন্নয়নশীল দেশগুলির অস্তিত্ব বিপন্ন ('সার্বভৌমত্ব সংক্রান্ত' অংশে এই বিষয়টি বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে)। কিছু উত্তর-উপনিবেশিক রাষ্ট্র (post-colonial state) আবার গৃহযুদ্ধ ইত্যাদির ফলে ব্যর্থ রাষ্ট্র বা 'failed state'-এ রূপান্তরিত হয়েছে। এই সকল দেশে এক ধরনের 'governance deficit' দেখা যায়। কিছুদিন আগেও রাষ্ট্রনীতির আলোচনায় 'retreat of state' কথাটি খুবই প্রচলিত ছিল; তবে ধীরে ধীরে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা একমত হচ্ছেন যে রাষ্ট্র এখনও তার প্রাসঙ্গিকতা হারায়নি। হে'উড বলেছেন, "the state may be reviving in importance" অর্থাৎ রাষ্ট্রের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। রাজীব ভার্গব ও অশোক আচার্য সম্পাদিত Political Theory গ্রন্থে স্বহা দাস রাষ্ট্র সংক্রান্ত একটি নিবন্ধে যথার্থই মন্তব্য করেছেন, "the impact of globalization on state sovereignty is much more complex than what the 'end of the state' thesis allows for." দুর্বল রাষ্ট্রগুলি একজোট হয়ে বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে চাইছে। স্বহা দাস এ প্রসঙ্গে "pooled sovereignty" কথাটি ব্যবহার করেছেন। মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী থেডা স্কচপল (Theda Skocpol) তাঁর *Bringing the State Back In* নিবন্ধে দেখিয়েছেন কীভাবে রাষ্ট্র সংক্রান্ত আলোচনা ধীরে ধীরে রাজনীতির মূল স্রোতে ফিরে আসছে।

জাতি (Nation)

Nation বা জাতি একটি বহুচর্চিত বিতর্কিত ধারণা। লাতিন শব্দ 'nasci' থেকে Nation শব্দটির উদ্ভব হয়েছে। যার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল 'জন্মগ্রহণ করা' (to be born)। জাতিকে বিভিন্ন দিক থেকে সংজ্ঞায়িত করা যায়। সাংস্কৃতিক দিক থেকে জাতি হল একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠী যা একটি অভিন্ন ভাষা, ধর্ম, ইতিহাস ও ঐতিহ্য দ্বারা আবদ্ধ। কিন্তু প্রত্যেক জাতির মধ্যেই সাংস্কৃতিক বৈচিত্র লক্ষ করা যায়। রাজনৈতিক দিক থেকে জাতি হল একটি জনসম্প্রদায় যারা নিজেদের পৃথক ও স্বতন্ত্র রাজনৈতিক সম্প্রদায় হিসেবে গণ্য করে।

Scanned by CamScanner

একটি পৃথক রাষ্ট্র গঠন করাই এই জনসম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য। মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে জাতি হল এমন জনগোষ্ঠী যারা দেশের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে— partiotism বা দেশপ্রেমিকতা হল এর মূল বৈশিষ্ট্য। এই সকল জটিলতার জন্য জাতির সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন। অধ্যাপক হিমাচল চক্রবর্তী তাই বেজহট (Bagehot)-কে উদ্ধৃত করে বলেছেন, "আমরা জানি জাতি কী, যদি তা না জিগ্যেস করো, কিন্তু জিগ্যেস করলে চট্ করে তা ব্যাখ্যা করতে বা সংজ্ঞা দিতে পারি না।" ("We know what it is when you do not ask us, but we cannot very quickly explain or define it.")

রেনাঁ মন্তব্য করেছেন, বিশেষ ঐক্যচেতনা ও অপরের থেকে স্বাতন্ত্র্যবোধ নেশনের মূল কথা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'নেশন কী' রচনায় লিখেছেন, "নেশন একটি সজীব সত্তা, একটি মানস পদার্থ। দুইটি জিনিস এই পদার্থের অন্তঃপ্রকৃতি গঠিত করিয়াছে। সেই দুইটি জিনিস বস্তুত একই। তাহার মধ্যে একটি অতীতে অবস্থিত, আর একটি বর্তমানে। একটি হইতেছে সর্বসাধারণের প্রাচীন স্মৃতিসম্পদ, আর একটি পরস্পর সম্মতি, একত্রে বাস করিবার ইচ্ছা।" স্তালিন (Stalin) তাঁর মার্কসবাদ ও জাতিসমস্যা প্রবন্ধে বলেছেন, স্থায়ী জনসমষ্টি যা ভাষাগত ঐক্য, ভৌগোলিক সান্নিধ্য, অর্থনৈতিক সমস্বার্থ এবং সমরূপ মানসিকতার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে এবং যা একটি সাধারণ সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। Hans Kohn বলেছেন, "Nationalim is a state of mind, an act of consciousness." সর্বশেষে একটি কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। বাংলায় 'জাতি' শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হল 'নেশন' (Nation)। কিন্তু সমস্যা হল বাংলায় জাতি শব্দটিকে কখনো জাতপাত (caste), কখনো বর্ণ, কখনো কুল ইত্যাদি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। আবার জাতি ও রাষ্ট্র— এ দুটিকে অনেক সময় অভিন্ন বলে গণ্য করা হয়। কিন্তু জাতি হল একটি মনস্তাত্ত্বিক ধারণা, অপরদিকে, রাষ্ট্র হল একটি রাজনৈতিক ও আইনগত ধারণা। এক জাতি, এক রাষ্ট্র— ধারণার অনেক সমর্থক থাকলেও জাতি ও রাষ্ট্রের সীমানা সবক্ষেত্রে সমানুপাতিক হয় না।

প্রায় দুশো বছরেরও অধিক ধরে জাতি রাজনৈতিক শাসনের মূল একক (unit of political rule) বলে বিবেচিত হয়ে আসছে। হেউড দু'ধরনের জাতীয়তাবাদের কথা বলেছেন— inclusive nationalism যা বিভিন্ন জাতি ও নৃকুলগত গোষ্ঠী (ethnic group)-কে জাতির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে। এখানে common identity বা অভিন্ন পরিচিতির ওপর জোর দেওয়া হয় না। অন্যদিকে রয়েছে 'exclusive nationalism'— যেখানে একটি মাত্র 'race' বা জাতিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়— সংখ্যালঘুদের অবহেলা করা হয়। Benedict Anderson জাতিকে একটি কল্পিত সম্প্রদায় বা 'imagined community' রূপে দেখেছেন। স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের দাবিতে জাতীয় জনসমাজ জাতিতে পরিণত হয় ঠিকই, কিন্তু রাষ্ট্র যে একজাতিভিত্তিক হবেই এমন কোনো কথা নেই।

জাতীয় জনসমাজের দু'ধরনের উপাদান আছে— (ক) বস্তুগত বা বাহ্যিক উপাদান (material elements) যার মধ্যে রয়েছে ভাষাগত ঐক্য, ভৌগোলিক ঐক্য, জাতিকুলগত ঐক্য, অর্থনৈতিক সমস্বার্থ ও ধর্ম এবং (খ) ভাবগত বা মানসিক উপাদান (Spiritual elements)। ভাবগত ঐক্যের মধ্যে রয়েছে অতীতের স্মৃতি ও ভবিষ্যতের আদর্শ।

জাতির সংজ্ঞা

Oxford English Dictionary-তে Nation বা জাতির নিম্নলিখিত সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে: A large body of people united by common descent, history, culture or language inhabiting a particular state or territory. অর্থাৎ একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠী যাদের বংশগত, ভাষাগত, ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক অভিন্নতা রয়েছে এবং যারা একটি নির্দিষ্ট রাষ্ট্র ও ভূখণ্ডে বসবাস করে।

একটি জনসমষ্টি রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত হওয়ার প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই জাতীয় জনসমাজ (Nationality) থেকে জাতি (Nation)-তে রূপান্তরিত হয়।

জাতি ও রাষ্ট্রের পার্থক্য

- জাতি একটি মনস্তাত্ত্বিক ধারণা, পক্ষান্তরে রাষ্ট্র হল একটি রাজনৈতিক ও আইনগত ধারণা।
- জাতি গঠনের জন্য সার্বভৌম ক্ষমতার প্রয়োজন নেই, কিন্তু রাষ্ট্রের একটি অপরিহার্য উপাদান হল সার্বভৌমত্ব।
- জাতি ও রাষ্ট্রের সীমানা সর্বক্ষেত্রে সমানুপাতিক হয় না। জাতির সীমানা রাষ্ট্রের ভৌগোলিক সীমানাকে অতিক্রম করতে পারে।

'সার্বভৌমকতা' ধারণার বিকাশ (Evolution of The concept of Sovereignty)

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মৌলিক বিষয়বস্তু হিসেবে রাষ্ট্রের সঙ্গে যে ধারণাটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত তা হল সার্বভৌমত্ব। গেটেল বলেছেন, আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভিত্তি হল সার্বভৌমিকতা। ধারণাটির বিভিন্ন ধরনের সংজ্ঞা থাকলেও সাধারণভাবে সার্বভৌমিকতা বলতে রাষ্ট্রের চূড়ান্ত, নিরঙ্কুশ ও চরম ক্ষমতাকে বোঝায়।

গেটেল বলেছেন সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে প্রাচীন ও মধ্যযুগের লেখকদের ধারণা ছিল বেশ অস্পষ্ট ও বিভ্রান্তিকর। গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটলের রচনায় রাষ্ট্রের 'চূড়ান্ত ক্ষমতা'র উল্লেখ

Scanned by CamScanner

পাওয়া গেলেও পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্বে 'সার্বভৌমিকতা' শব্দটির প্রয়োগ দেখা যায় না। প্রাচীন গ্রিক রাষ্ট্রচিন্তায় রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে পার্থক্য করা হত না এবং নগররাষ্ট্রগুলি নাগরিক-প্রশাসক (Citizen Administrator) দ্বারা পরিচালিত হত। রোমান সাম্রাজ্যের যুগে যদিও একটি কেন্দ্রীভূত কর্তৃত্বের ধারণা সুপ্রতিষ্ঠিত হয় তথাপি একদিকে বিশ্ব সাম্রাজ্যের আদর্শ ও অন্যদিকে উপজাতীয় সামন্ততান্ত্রিক আনুগত্যের টানাপোড়েনে সার্বভৌমিকতার ধারণা তার আধুনিক ব্যঞ্জনা লাভ করতে পারেনি। রোম সাম্রাজ্যের পতনের পর খ্রিস্টধর্ম চিন্তা জগতে আধিপত্য বিস্তার করে। ধর্মসংস্কার আন্দোলনের যুগে পোপের প্রাধান্য চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয় ও রাজনৈতিক সামন্তপ্রভু, রাজা ও পোপের কর্তৃত্বের লড়াইয়ের মধ্যেই সার্বভৌমিকতার আধুনিক তত্ত্বটির জন্ম হয়েছে। মধ্যযুগে রাজার সঙ্গে চার্চের বিরোধ-বিতর্ক-সংগ্রামের সূচনা হল। ধীরে ধীরে কেন্দ্রীভূত রাজনৈতিক ক্ষমতা তৈরি হতে থাকল।

সার্বভৌমিকতার সংজ্ঞা

লাতিন শব্দ সুপারেনাস্ (superanus) থেকে ইংরাজি 'Sovereignty' শব্দটি এসেছে। সুপারেনাস্ শব্দটির অর্থ 'সর্বশ্রেষ্ঠ' (supreme)। সুতরাং বুৎপত্তিগত অর্থে সার্বভৌমিকতা বলতে রাষ্ট্রের নিরঙ্কুশ, সর্বশ্রেষ্ঠ ও অবাধ ক্ষমতাকেই বোঝায়। বোদাঁর মতে সার্বভৌমত্ব হল রাষ্ট্রের এমন এক আদেশ-প্রদানকারী চরম, শাশ্বত ও চিরস্থায়ী ক্ষমতা যা নাগরিক ও প্রজাদের ওপর বর্তায় এবং যে ক্ষমতা আইন দ্বারা অনিয়ন্ত্রিত।

অধ্যাপক ল্যাস্কি তাঁর *A Grammar of Politics* গ্রন্থে লিখেছেন যে, ষোড়শ শতাব্দী থেকে ইউরোপে উদীয়মান জাতি, রাষ্ট্র ও চার্চের মধ্যে সংঘর্ষের পরিণামে নির্দিষ্ট পৃথক পৃথক ভূখণ্ডে কেন্দ্রীভূত ক্ষমতাসম্পন্ন রাষ্ট্রগুলির ধারণা পাওয়া যায়। ধর্মীয় অনুশাসনের শৃঙ্খল ছিন্ন করে ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয় রাষ্ট্রগুলির আবির্ভাবের পথ সুগম হল। আইনগত রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের ধারণা এই সূত্রেই তৈরি হয়। নবজাগরণ ও ধর্মসংস্কার আন্দোলনের ফলে ইউরোপের রাজশক্তি নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ পেল। ঐক্যবদ্ধ জাতীয় রাষ্ট্রের সার্বভৌম শাসক হিসেবে নৃপতিরা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করলেন। অধ্যাপক সি.ডি. বার্নস এই প্রেক্ষিতটিকে মনে রেখেই মন্তব্য করেছেন যে, সার্বভৌমত্ব ইউরোপের নবজাগরণের ফল।

ষোড়শ শতকে ফরাসি দার্শনিক জাঁ বোদাঁ (১৫৩০-১৫৯৬) সর্বপ্রথম রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতার ধারণাটির প্রকৃতি বিশ্লেষণ করেন। ১৫৮৬ সালে প্রকাশিত তাঁর *Six Books on the Republic* শীর্ষক গ্রন্থে বোদাঁ এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে "আইনের দ্বারা অনিয়ন্ত্রিত নাগরিক ও প্রজাদের ওপর রাষ্ট্রের চরম ক্ষমতাই হল সার্বভৌম ক্ষমতা।"

সার্বভৌমিকতার বৈশিষ্ট্য

- সার্বভৌম কর্তৃত্ব চরম।
- সার্বভৌম কর্তৃত্ব শাশ্বত ও চিরস্থায়ী।
- সার্বভৌম ক্ষমতা আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়।
- সার্বভৌম ক্ষমতা অবিভাজ্য।
- সার্বভৌম ক্ষমতা অহস্তান্তরযোগ্য।
- সার্বভৌম ক্ষমতাই রাষ্ট্রকে অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠান থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করে স্বকীয়তা প্রদান করেছে।

বোদাঁর পর সার্বভৌমত্বের তাত্ত্বিক হিসেবে হল্যান্ডের আইনবিদ হুগো গ্রোটিয়াস (Hugo Grotius)-এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গ্রোটিয়াস তাঁর রচনায় রাষ্ট্রের বাহ্যিক সার্বভৌমত্বের বিষয়টিকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন।

সার্বভৌমিকতার ধারণা আরও বিকশিত হয় ইংরেজ দার্শনিক টমাস হবসের রচনায়। রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সামাজিক অরাজকতা কাটিয়ে উঠতে হবস তাঁর *Leviathan* গ্রন্থে সার্বভৌম শক্তির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

সপ্তদশ শতকেরই শেষার্ধে ইংল্যান্ডের আরও একজন চুক্তিবাদী দার্শনিক জন লকের তত্ত্বে পাওয়া যায় সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্র (limited monarchy) ও গণ-সার্বভৌমত্ব (popular sovereignty)-এর প্রাথমিক ধারণা। লক শাসিতের সম্মতি (consent)-এর ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেন। লকের রচনায় গণ-সার্বভৌমত্বের এই প্রাথমিক ধারণা আরও দৃঢ় রূপে প্রতিষ্ঠা পায় অষ্টাদশ শতকের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ চুক্তিবাদী দার্শনিক রুশোর 'সাধারণ ইচ্ছা' তত্ত্বে। বেন্থাম সার্বভৌমত্বের ধারণাটি ব্যাখ্যা করেছেন উপযোগিতাবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে। তাঁর মতে, সার্বভৌম রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন করে 'সর্বাধিক মানুষের সর্বাধিক সুখ'-এর জন্য। আর এই লক্ষ্য পূরণ করতে পারলেই রাষ্ট্র মানুষের স্বাভাবিক আনুগত্য অর্জন করতে সমর্থ হয়।

বোদাঁ থেকে শুরু করে রুশো বা বেন্থাম পর্যন্ত সার্বভৌমিকতার তত্ত্ব নিয়ে যে ধারাবাহিক আলোচনা গড়ে ওঠে তা আইনগত দিক থেকে পরিপূর্ণতা লাভ করে অস্টিনের *Lectures on Jurisprudence* (১৮৩২) শীর্ষক রচনায়। অস্টিন সার্বভৌমিকতার একত্ববাদী তত্ত্বের প্রধান প্রবক্তা রূপে সুপরিচিত। এই তত্ত্ব অনুযায়ী সার্বভৌমিকতা রাষ্ট্রের চরম ও চূড়ান্ত ক্ষমতা এবং সার্বভৌমের নির্দেশই হল আইন (Law is the command of the Sovereign.)

Scanned by CamScanner

একত্ববাদী তত্ত্ব

একত্ববাদী তত্ত্বে রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে আইনগত দিক থেকে চরম, অনিয়ন্ত্রিত, অসীম ও অবিভাজ্য বলে মনে করা হয়। সার্বভৌমিকতার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে অস্টিন বলেছেন, যদি কোনো সমাজে নির্দিষ্ট কোনো ঊর্ধ্বতন মানবীয় কর্তৃপক্ষ অন্য কোনো অনুরূপ কর্তৃপক্ষের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন না করেও সেই সমাজের অধিকাংশ মানুষের স্বভাবজাত আনুগত্য লাভ করে, তাহলে ওই নির্দিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ হল সার্বভৌম এবং ওই কর্তৃপক্ষসহ সমাজটি হল রাজনৈতিক ও স্বাধীন সমাজ।

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে একত্ববাদী তত্ত্বের সমালোচনা করা হয়েছে। গিয়ার্কে, ক্র্যাব, দুগুই, ল্যাস্কি, বার্কার, ম্যাকাইভার প্রমুখ বহুত্ববাদীগণ একত্ববাদী তত্ত্বকে কঠোরভাবে সমালোচনা করেছেন। বহুত্ববাদীদের মতে, সামাজিক জীব হিসেবে মানুষের বহুমুখী জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশসাধন রাষ্ট্র এককভাবে করতে পারে না। মানুষের ব্যক্তিত্বের সম্যক বিকাশে বিভিন্ন সংঘ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই সংঘগুলির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও নিজস্ব স্বাধীন সত্তা রয়েছে। নিজ নিজ ক্ষেত্রে এই সংঘগুলি স্বাধীন ও স্বাভাবিকভাবেই মানুষের আনুগত্য দাবি করতে পারে। বহুত্ববাদীদের মতে, রাষ্ট্র হল এই সব সংঘের মতো একটি সংঘ। অধ্যাপক ল্যাস্কি বলেছেন, মানুষের আনুগত্য বহুমুখী, তাই রাষ্ট্র এককভাবে চরম সার্বভৌমত্ব দাবি করতে পারে না।

বহুত্ববাদের মূল বক্তব্য

বহুত্ববাদীদের মতে সমাজের মধ্যে রাষ্ট্র ছাড়াও নানাপ্রকার সংঘ, গোষ্ঠী, সংগঠন প্রভৃতি থাকে। এগুলি রাষ্ট্রের মতোই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। গিয়ার্কে ও মেটল্যান্ডের মতে, ওইসব সংঘ সামাজিক প্রয়োজনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে উঠেছে। রাষ্ট্র কখনোই এদের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। বহুত্ববাদীদের মতে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা কোনো অর্থেই অবিভাজ্য, অসীম ও চূড়ান্ত নয়।

বিশ্বায়নের ফলে আধুনিক আন্তর্জাতিক জীবনে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশ শতকের প্রযুক্তিগত বিপ্লব যোগাযোগ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছে। কোনো রাষ্ট্রই এখন আর অপর রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। ব্যবসা-বাণিজ্যের দুনিয়া-জোড়া প্রসার, সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান, পারস্পরিক

নির্ভরশীলতা এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে যে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতার ধারণার পরিবর্তন ঘটেছে। লেস্টার ব্রাউন তাঁর *World without Border* গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, ঐক্যবদ্ধ আন্তর্জাতিক সমাজের ধারণা এখন আর অলীক কল্পনা নয়; রীতিমতো বাস্তব ঘটনা। কেনিচি ওমে-ও তাঁর *The End of the Nation State* বইতে লিখেছেন যে, আধুনিক বিশ্বায়নের প্রক্রিয়ায় জাতীয় সার্বভৌমত্বের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া মুশকিল। তবে রাষ্ট্রগুলি সম্পূর্ণরূপেই তাদের সার্বভৌম ক্ষমতা হারিয়েছে একথা বলা সমীচীন হবে না।

বিশ্বায়নের যুগে দুটি পরস্পর-বিরোধী প্রক্রিয়া সমান্তরালভাবে চলেছে— একদিকে দেখা যাচ্ছে ভাষা বৈচিত্র্য, খাদ্য বৈচিত্র্য, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য লুপ্ত হয়ে একমুখীনতার দুর্বার অগ্রগতি; একটি বিশেষ ধরনের সংস্কৃতির বা স্পষ্ট করে বললে পশ্চিমি তথা মার্কিন সংস্কৃতির আধিপত্য। আবার অন্যদিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্তা ও জনগোষ্ঠীগুলি জীর্ণ ও বিপন্ন হয়েও তাদের টিকে থাকার ও স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। এই দুই বিপরীতমুখী স্রোতের দ্বৈরথে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতার চিরায়ত তত্ত্ব এখন সংকটের মুখে। অর্থনীতি, বাণিজ্য, প্রযুক্তি, যোগাযোগ সবদিক থেকেই রাষ্ট্রগুলি আজ পরস্পর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। ইন্টারনেট ও সি.এন.এন.-এর সৌজন্যে 'গ্লোবল্ ভিলেজ'-এর ধারণা আজ আর কল্পনামাত্র নয়; এটি এখন বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করেছে। তাই ভৌগোলিক সীমানায় রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব অপ্রতিহত থাকলেও, 'সাইবারস্পেস' তথা মানুষের মনোজগৎ এখন আর পূর্বের মতো রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন নয়। তাছাড়া, মানবাধিকার রক্ষার দোহাই দিয়ে 'হিউম্যানিটেরিয়ান ইন্টারভেনশন' বা মানবিক হস্তক্ষেপের অছিলায় বৃহৎ শক্তিগুলি তৃতীয় বিশ্বের দুর্বল দেশগুলির অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা চালাচ্ছে। তাই ওয়েস্টফেলিয় সার্বভৌমিকতার ধারণা— অর্থাৎ কোনো রাষ্ট্র অন্য কোনো রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না— এই ধারণা আজ বিরাট চ্যালেঞ্জের মুখে।

গ্রন্থসূত্র:

১। মুখোপাধ্যায়, গৌতম, "সার্বভৌমিকতা: বিভিন্ন প্রেক্ষিত"— দীপক কুমার দাশ (সম্পাদিত), রাজনীতির তত্ত্বকথা (১)।
২। Laski, Harold, *A Grammar of Politics*.
৩। Barker, E., *Priciples of Social and Political Theory*.
৪। সরকার, অশোককুমার, *সংসদ রাষ্ট্রবিজ্ঞান অভিধান*।
৫। Bhargava, R and Acharya, A. (ed.), *Political Theory*.
৬। চক্রবর্তী, হিমাচল, রাষ্ট্রবিজ্ঞান।

Scanned by CamScanner

তৃতীয় অধ্যায়

ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব— প্রকারভেদ ও আন্তঃসম্পর্ক

(Power and Authority – Types and Linkages)

রাজনীতির আলোচনায় ক্ষমতা একটি কেন্দ্রীয় ধারণা। Alan R. Ball তাঁর *Modern Politics and Government* গ্রন্থে বলেছেন, "Power is a key concept in the study of politics . . ." অর্থাৎ রাজনীতির আলোচনায় ক্ষমতা একটি মূল ধারণা। কারণ, রাজনীতি বলতে যদি বিরোধের মীমাংসাকে বোঝায় তাহলে একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থায় কীভাবে বিরোধের মীমাংসা সম্ভব হবে এবং কীভাবেই বা সব পক্ষ যথাযথভাবে সেই মীমাংসা মেনে চলবে, ক্ষমতার বণ্টন তা নির্ধারণ করে দেয়। অনুরূপভাবে Harold D. Lasswell তাঁর *Politics: Who Gets, What, When and How?* গ্রন্থে লিখেছেন, "Politics is the study of influence and the influential" অর্থাৎ প্রভাব ও প্রভাবশালীদের সম্পর্কে আলোচনা করাই হল রাজনীতির পাঠ্য বিষয়।

ক্ষমতার সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন। নিবেদিতা মেনন তাঁর 'Power' শীর্ষক নিবন্ধে (*Political Theory: An Introduction*, ed. by Bhargava and Acharya) বলেছেন রবার্ট ডাল (Dahl) প্রদত্ত সংজ্ঞাটি সর্বাধিক প্রচলিত। ডাল তাঁর *Modern Political Analysis* গ্রন্থে বলেছেন "A has power over B to the extent that A can get B to do something which B would not otherwise do." A-এর B-এর ওপর ক্ষমতা আছে বুঝতে হবে যদি A, B-এর অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে দিয়ে কিছু কাজ করতে বাধ্য করাতে পারে। Bertrand Russell তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ *Power: A Social Analysis*-এ বলেছেন যে, 'কাঙ্ক্ষিত ফললাভ' ('The production of intended effects')-ই হল ক্ষমতা। Alan Ball-এর মতে বলপ্রয়োগ কিংবা অন্যভাবে অর্থাৎ বুঝিয়ে-সুজিয়ে অথবা পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে অন্যের রাজনৈতিক আচরণকে প্রভাবিত

করার সামর্থ্য হল ক্ষমতা। রাজনৈতিক ক্ষমতার ক্ষেত্রে দু'ধরনের পদ্ধতি প্রযুক্ত হয়— Positive Sanction বা ইতিবাচক পদক্ষেপ, অর্থাৎ কোনো কিছুর প্রলোভন দেখিয়ে অন্যের আচরণকে প্রভাবিত করা এবং Negetive Sanction বা নেতিবাচক পদক্ষেপ বা শাস্তিদান বা ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে অন্যের রাজনৈতিক আচরণকে প্রভাবিত করা। অধ্যাপক ফ্র্যাঙ্কেল (Frankel)-এর মতে ক্ষমতা হল 'প্রত্যাশিত ফললাভের সামর্থ্য' (Capacity to produce intended effects)।

'ক্ষমতা' আলোচনার ক্ষেত্রে Steven Lukes-এর বক্তব্য ও বিশ্লেষণ প্রণিধানযোগ্য। Lukes তাঁর *Power: A Radical View* গ্রন্থে বলেছেন, "Power is essentially a contested concept" অর্থাৎ ক্ষমতা একটি বিতর্কিত ধারণা। Lukes ক্ষমতার তিনটি দিক বা 'three dimensions of power'-এর কথা উল্লেখ করেছেন। সংক্ষেপে তাঁর বক্তব্য নিম্নরূপ:

১। একটি গোষ্ঠী বা একজন ব্যক্তি যখন তার নিজের স্বার্থে অন্য গোষ্ঠী বা ব্যক্তির উপর তার ইচ্ছাকে চাপিয়ে দেয় তখন সেটি হল ক্ষমতার একটি উল্লেখযোগ্য রূপ।

২। আবার ক্ষমতা অন্য রকম ভাবেও প্রযুক্ত হতে পারে। যেমন কোনো বিশেষ বিষয়কে বিতর্কে বা আলোচনায় আসতেই দেওয়া হল না। কোনো বিশেষ ইস্যুকে আলোচনার পরিসরে আসতে না দেওয়া ক্ষমতার এক ধরনের বহিঃপ্রকাশ।

৩। Lukes-এর মতে ক্ষমতার সম্পর্কে তৃতীয় দৃষ্টিভঙ্গি হল চরম (radical); মনস্তাত্ত্বিক উপায়ে মানুষের মন ও রুচিকে এমনভাবে প্রভাবিত করা হয় যে সে বুঝতেই পারে না যে তার ওপর ক্ষমতা প্রয়োগ করা হচ্ছে। অন্যদিকে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে ক্ষমতার মূল কথা হল শোষণ (Power as exploitation)।

নারীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে patriarchy বা পুরুষতন্ত্রের সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ক্ষমতার প্রকৃতি বিচার করা হয়। Kate Millet তাঁর Sexual Politics গ্রন্থে নারী-পুরুষের সম্পর্ককে 'power-structured relationship' বলে চিহ্নিত করেছেন।

Keith Boulding তাঁর *Three Faces of Power (1989)* গ্রন্থে ক্ষমতার তিনটি দিকের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে তিন রকম উপায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণকে প্রভাবিত করা যেতে পারে:

› ভীতি প্রদর্শন করে বা বলপ্রয়োগ করে ('The Stick')

› এক ধরনের বোঝাপড়া করে ('The Deal') এবং

› প্রলোভন দেখিয়ে বা আনুগত্য সৃষ্টি করে ('The Kiss')

Andrew Heywood তাঁর *Politics* গ্রন্থে প্রায় একইভাবে ক্ষমতার তিনটি মাত্রার কথা উল্লেখ করেছেন:

- Power as decision-making— সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া হিসাবে রাজনীতি।
- Power as agenda setting— অর্থাৎ আলোচ্য বস্তু নির্ধারণ করে দেবার সামর্থ্য বা কোন বিষয়কে সিদ্ধান্ত-গ্রহণের প্রক্রিয়া থেকে সরিয়ে রাখা।
- Power as thought control— চিন্তাপ্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করা হিসেবে ক্ষমতা।

রবার্ট ডাল, অ্যালান বল, স্টিফেন ওয়াসবি প্রমুখ লেখককে অনুসরণ করে ক্ষমতার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়।

• **ক্ষমতা হল সম্পর্ককেন্দ্রিক (Power is Relational):** একাধিক ব্যক্তি, গোষ্ঠী, শ্রেণি বা রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে ক্ষমতার সম্পর্ক আবর্তিত হয়। ড্যানিয়েল ডিফোর উপন্যাসকে উল্লেখ করে অ্যালান বল বলেছেন, Man Friday না আসা পর্যন্ত রবিনসন ক্রুসো একাকী দ্বীপে কারুর ওপর ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেনি।

• **ক্ষমতা হল আচরণকেন্দ্রিক ধারণা (Power is Behavioural):** ক্ষমতাশালী ও ক্ষমতাধীন উভয়ের আচরণই ক্ষমতা প্রয়োগের ফলে প্রভাবিত হয়।

• **ক্ষমতা একটি পরিস্থিতিকেন্দ্রিক ধারণা (Power is Situational):** ক্ষমতা একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে কার্যকর হয়। যেমন লোকসভার মধ্যে অধ্যক্ষ চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু বাইরে তাঁর ক্ষমতা সীমিত।

• **ক্ষমতা সমাজে অসমানভাবে বণ্টিত (Power is Asymmetrical):** ক্ষমতা সমাজে সমানভাবে বণ্টিত হয় না। এখানে রাজনৈতিক প্রবর শ্রেণি বা Political elites-এর ধারণাটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্যারেটো, মসকা, মিচেলস্ প্রমুখ প্রবরবাদী বা এলিট তাত্ত্বিকদের মতে সব সমাজই দুটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত। এই দুটি গোষ্ঠী হল শাসক ও শাসিত। তাঁদের মতে একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠী বা এলিট সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করে। বহুত্ববাদীরা অবশ্য এই তত্ত্বে বিশ্বাস করেন না। তাঁদের মতে ক্ষমতা লাভের জন্য বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা চলতে থাকে। বহুত্ববাদ বা Pluralism-এর অন্যতম প্রধান প্রবক্তা হলেন রবার্ট ডাল।

Raven-এর মত ছয় ধরনের ক্ষমতা আছে:

১। Reward Power— পুরস্কৃত করার ক্ষমতা।

২। Coercive Power— শাস্তি প্রদানের ক্ষমতা।

৩। Referent Power— কোনো নির্দেশক গোষ্ঠীর অন্যদের আচরণকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা।

৪। Legitimate Power— বৈধ ক্ষমতা।

৫। Expert Power— কোনো বিশেষজ্ঞের কোনো বিশেষ বিষয় সম্পর্কে সামর্থ্য।

৬। Informational Power— আজকের তথ্যপ্রযুক্তি বিপ্লবের যুগে 'Information is power'।

উত্তর-আধুনিক দার্শনিক মিশেল ফুকো ক্ষমতাকে দেখেছেন "as a structurral expression of a complex strategic situation in a given social setting that requires both constraint and enablement."। ফুকো আধুনিক সমাজে ক্ষমতার তিনটি মাত্রা লক্ষ করেছেন: (১) সার্বভৌমত্ব (Sovereignty), (২) অনুশাসন (Discipline) এবং (৩) প্রশাসনিকতা (Governmentality)। সার্বভৌম ক্ষমতা ছিল দখলের অধিকার: জিনিস, সময়, শরীর, ও শেষ অবধি স্বয়ং জীবনকেই দখলের অধিকার। ক্ষমতার সার্বভৌম রূপের অনেকটা পরিবর্তন নিয়ে এল জৈব ক্ষমতা। জৈব ক্ষমতার দুটি অভিমুখ থেকে পরে ক্রমশ উদ্ভব হল ক্ষমতার দুটি নতুন ও আধুনিক মাত্রা: অনুশাসন বা Discipline এবং প্রশাসনিকতা বা Governmentality। ক্ষমতা এখন আর শুধুমাত্র রাষ্ট্রে সীমাবদ্ধ নয়। ক্ষমতা সমস্ত স্তরে ও আকারে ব্যাপ্ত (dispersed)। অনুশাসন হল মানুষের মন তথা মননকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রক্রিয়া। এখানে সার্বিক নজরদারি বা প্যানঅপ্টিকনের ধারণাটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এর পরের ধাপটি হল প্রশাসনিক প্রকরণকে আরও কার্যকর ও শক্তিশালী করে তোলা। প্রশাসনের পর্যবেক্ষণ ও লক্ষ্যবস্তু জনসমষ্টি।

ইতালীয় মার্কসবাদী দার্শনিক গ্রামশ্চি (Gramsci) ক্ষমতার আলোচনাকে সমৃদ্ধ করেছেন তাঁর আধিপত্যবাদ বা হেজিমনি (Hegemony) ধারণার দ্বারা। হেজিমনি হল নৈতিক ও বৌদ্ধিক নেতৃত্ব (moral and intellectual leadership)। গ্রামশ্চির মতানুসারে একটি সংহত পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ক্ষমতার অন্যতম প্রধান উৎসটি হল সামগ্রিক পৌর সমাজ (Civil Society), অর্থাৎ তার সাংস্কৃতিক-মতাদর্শগত পরিমণ্ডল এবং তার প্রতিনিধিত্ব করে যে প্রতিষ্ঠানসমূহ সেগুলি। এই আধিপত্যের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণিকে রাষ্ট্র-ক্ষমতা দখল করতে হলে বিকল্প আধিপত্য স্থাপন করতে হবে।

লুই আলথুসে ক্ষমতার আলোচনাকে সমৃদ্ধ করেছেন তাঁর পুঁজিবাদী রাষ্ট্রশক্তির বিশ্লেষণের মাধ্যমে। তাঁর মতে শুধুমাত্র বলপ্রয়োগমূলক যন্ত্র (Repressive State Apparatus) দ্বারা পুঁজিবাদ তার ক্ষমতা কায়েম করে না; সমান গুরুত্বপূর্ণ হল মতাদর্শগত যন্ত্র (Ideological State Apparatus)।

Scanned by CamScanner

ক্ষমতার কয়েকটি মাত্রা

Andrew Heywood বলেছেন ক্ষমতাকে বিভিন্ন রকমভাবে দেখা হয়েছে:

- Power as decision making অর্থাৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সামর্থ্য হিসেবে ক্ষমতা।
- Power as agenda setting অর্থাৎ আলোচনাসূচি বা বিতর্কের বিষয় স্থির করে দেবার সামর্থ্য।
- Power as thought control অর্থাৎ মানুষের মনন ও চিন্তনকে নিয়ন্ত্রণ করার সামর্থ্য হিসেবে ক্ষমতা।

ক্ষমতার সঙ্গে প্রভাব বা influence-এর পার্থক্য আছে। ক্ষমতার সঙ্গে বলপ্রয়োগের ধারণা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ল্যাসওয়েল ও ক্যাপলান তাঁদের *Power and Society* বইতে বলেছেন, "It is the threat of sanctions which differentiates power from influence in general…"।

কর্তৃত্ব (Authority)

Oxford English Dictionary অনুযায়ী authority বা কর্তৃত্বের অর্থ হল, "the power or right to give orders, make decisions, and enforce obedience." অর্থাৎ কর্তৃত্ব হল নির্দেশ দান, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও আনুগত্য আদায়ের ক্ষমতা বা অধিকার।

রাজনৈতিক ক্ষমতা নিজে নিজে কার্যকর হয় না। ক্ষমতাকে কার্যকর করতে হলে প্রয়োজন হয় কর্তৃত্বের। অধ্যাপক অ্যালান বল তাই বলেছেন, "Political power is usually accompanied by authority"। সহজ কথায় বলা যায় কর্তৃত্ব হল ক্ষমতা প্রয়োগ করার বৈধ অধিকার। তাই অনেকে বলেছেন, "Authority is legitimate power" অর্থাৎ কর্তৃত্ব হল বৈধ ক্ষমতা। Andrew Heywood বলেছেন, "Authority is power cloaked in legitimacy or rightfulness"। নীতিমানবাচক শব্দ হিসেবে ব্যবহার করলে কর্তৃত্ব বলতে শাসকের শাসন করবার নৈতিক অধিকার (right to rule) বোঝায়। নির্বাচনী ফলাফল বা সাংবিধানিক বিধি থেকে এই শাসন করার অধিকার আসতে পারে। অধ্যাপক অ্যালান বলের মতে শাসকের শাস্তিদানের ক্ষমতা নির্বিশেষে তাঁর শাসন করার অধিকারের স্বীকৃতি প্রদানই হল রাজনৈতিক কর্তৃত্ব (political authority is the recognition of the right to rule irrespective of the sanctions the ruler may

possess)। জার্মান সমাজতাত্ত্বিক ম্যাক্স ওয়েবার (Max Weber) কর্তৃত্ব বলতে 'বৈধ ক্ষমতা' অর্থাৎ 'ক্ষমতা' ও 'বৈধতা'র সমন্বিত রূপকে বোঝাতে চেয়েছেন।

কর্তৃত্বের প্রকারভেদ (Types of Authority)

রাষ্ট্র দার্শনিকেরা কর্তৃত্বকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করেছেন, যথা— (১) আইনসঙ্গত কর্তৃত্ব (de jure authority) এবং (২) বাস্তব কর্তৃত্ব (de facto authority)। ম্যাক্স ওয়েবার সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে তিন ধরনের কর্তৃত্বের কথা বলেছেন। যথা— (১) সাবেকি কর্তৃত্ব (Traditional Authority), (২) গণমোহিনী কর্তৃত্ব (Charismatic Authority) এবং (৩) আইনগত-যুক্তিসঙ্গত কর্তৃত্ব (Legal-rational Authority)।

১। সাবেকি কর্তৃত্ব (Traditional Authority): Andrew Heywood বলেছেন, "Traditional Authority is rooted in history and tradition"। সুদীর্ঘকাল বংশানুক্রমিকভাবে শাসন করার ফলে শাসনের একটি ঐতিহ্য গড়ে ওঠে। এখানে শাসকের কর্তৃত্ব কোনো লিখিত আইন বা সাংবিধানিক বিধি নয়; ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার ও ঐতিহ্য। অধ্যাপক অ্যালান বল ইংল্যান্ডের রানির কর্তৃত্বকে এই ধরনের কর্তৃত্বের প্রকৃষ্ট উদাহরণ বলে বিবেচনা করেছেন।

২। গণমোহিনী কর্তৃত্ব (Charismatic Authority): Andrew Heywood বলেছেন, "Charismatic authority stems from the power of personality"। ব্যক্তিত্বের বিশেষ গুণাবলি গণমোহিনী কর্তৃত্বের ভিত্তি। ইতিহাসে দেখা গেছে জনপ্রিয় নেতা বা নেত্রীরা সাধারণ মানুষের স্বভাবজাত স্বেচ্ছা-আনুগত্য লাভ করেন। এই ধরনের কর্তৃত্বের উদাহরণ হিসেবে মহাত্মা গান্ধী, লেনিন, চার্লস দ্য গল প্রমুখ নেতার নাম উল্লেখ করা যায়। 'ক্যারিশমা' শেষ পর্যন্ত প্রাত্যহিক জীবনের বিষয়ে পরিণত হয়; ওয়েবার এটিকে 'routinization of charisma' বলে চিহ্নিত করেছেন।

৩। আইনগত-যুক্তিসঙ্গত কর্তৃত্ব (Legal-rational Authority): এই ধরনের কর্তৃত্বের ভিত্তি হল নৈর্ব্যক্তিক আইন। ওয়েবার এরূপ কর্তৃত্বকে আধুনিক শিল্পসমাজের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য বলে চিহ্নিত করেছেন। হে'উড বলেছেন, "Legal-rational authority is grounded in a set of impersonal rules associated with an office rather than the office holder." অর্থাৎ এখানে পদাধিকারী অপেক্ষা পদের ওপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। ম্যাক্স ওয়েবারের মতে আমলারা বৈধ-যুক্তিসঙ্গত কর্তৃত্বের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আধুনিক শিল্পাশ্রয়ী সমাজে আমলাতন্ত্রের প্রসার ঘটেছে। তবে ওয়েবারের মতে এই তিন ধরনের কর্তৃত্ব বিশুদ্ধ রূপে কোনো ব্যবস্থাতেই পরিলক্ষিত হয় না। বাস্তবে এদের মিশ্রিত রূপই দেখা যায়।

Scanned by CamScanner

রাজনৈতিক ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের সম্পর্ক

রাজনৈতিক ক্ষমতা ও রাজনৈতিক কর্তৃত্ব সমার্থক নয়। সংজ্ঞা, প্রকৃতি, কার্যপদ্ধতির প্রেক্ষাপটে উভয়ের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য আছে। ক্ষমতার সঙ্গে বলপ্রয়োগ গভীরভাবে যুক্ত, অপরদিকে সমাজে স্বীকৃত মূল্যবোধই কর্তৃত্বকে বৈধতা দান করে।

সংজ্ঞাগত দিক থেকে ক্ষমতা হল অন্যের আচরণকে নিজের ইচ্ছানুযায়ী পরিচালনা করার সামর্থ্য। বল বলেছেন, অন্যের রাজনৈতিক আচরণকে প্রভাবিত করার সামর্থ্যই হল রাজনৈতিক ক্ষমতা। অন্যদিকে কর্তৃত্ব বলতে সম্মতি লাভ করার সামর্থ্যকে বোঝায়। ক্ষমতা ও বৈধতার সমন্বয়ে কর্তৃত্বের সৃষ্টি হয়। অধ্যাপক অ্যালান বলের মতে, "শাসকের শাস্তিদানের ক্ষমতা নির্বিশেষে তাঁর শাসন করার অধিকারের স্বীকৃতি" ("The recognition of the right to rule irrespective of the sanctions the ruler may possess.") প্রদানই হল রাজনৈতিক কর্তৃত্ব।

জার্মান সমাজতাত্ত্বিক ম্যাক্স ওয়েবার (Max Weber) সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে তিন ধরনের কর্তৃত্বের কথা বলেছেন। যথা: (১) সাবেকি কর্তৃত্ব (Traditional Authority) অর্থাৎ দীর্ঘকাল ধরে বংশানুক্রমিকভাবে শাসন করার ফলে যে বৈধতার সৃষ্টি হয়। (২) গণমোহিনী কর্তৃত্ব (Charismatic Authority) অর্থাৎ ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বিশেষ গুণাবলির ভিত্তিতে জনমানসে যে বৈধতার সৃষ্টি হয় তাকে বলে গণমোহিনী কর্তৃত্ব। (৩) আইনগত-যুক্তিসঙ্গত কর্তৃত্ব (Legal-Rational Authority) অর্থাৎ বিধি বা নিয়মাবলির বৈধতার প্রতি বিশ্বাসের ভিত্তিতে এরূপ কর্তৃত্ব গড়ে ওঠে। কর্তৃত্বহীন ক্ষমতা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। অধ্যাপক অ্যালান বল বলেছেন, বলপ্রয়োগের মাধ্যমে আনুগত্য অর্জিত হলে তা অস্থায়ী হতে বাধ্য। ক্ষমতা কার্যকর ও স্থায়ী হয় শুধু বৈধতার মধ্য দিয়ে। বল মন্তব্য করেছেন, "Obedience secured only by the threat of sanctions is untenable"।

বহু ক্ষেত্রে রাজনৈতিক কর্তৃত্বহীন ব্যক্তিও রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ সামরিক অভ্যুত্থানের পর কোনো সেনাপতি রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করলে জনগণ ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে তার ক্ষমতাকে স্বীকার করে থাকে। তাই বল বলেছেন, "Political power may be divorced from political authority"। উদাহরণস্বরূপ বল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। ওই সময় জার্মান-অধিকৃত ফ্রান্সে চার্লস দ্য গলের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব স্বীকৃতিলাভ করলেও জার্মান ও জার্মান-সমর্থক ফরাসি সরকার বলপ্রয়োগের মাধ্যমে তাঁর সেই কর্তৃত্বকে রাজনৈতিক ক্ষমতায় রূপান্তরিত করতে পারেনি। এর ফলে দ্য গলের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব কার্যত

কার্যহীন হয়ে পড়ে। তিব্বত থেকে নির্বাসিত ভারতে আশ্রিত দালাই লামার ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য। দালাই লামার বৈধতা থাকা সত্ত্বেও রাজনৈতিক ক্ষমতা নেই।

রবার্ট ডাল দু'ধরনের ক্ষমতা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, যথা— (১) বৈধ ক্ষমতা (Legitimate Power) এবং (২) অবৈধ ক্ষমতা (Illegitimate Power)। যে ক্ষমতার পিছনে আইনের সমর্থন থাকে, তাকে তিনি বৈধ ক্ষমতা বলে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু যে ক্ষমতার পিছনে আইনের সমর্থন থাকে না তা হল অবৈধ ক্ষমতা। কিন্তু কর্তৃত্ব সর্বদাই বৈধ ক্ষমতা (Authority is legitimate power)।

রাজনৈতিক ক্ষমতা ও রাজনৈতিক কর্তৃত্বের মধ্যে বিভিন্ন পার্থক্য সত্ত্বেও তাদের আন্তঃসম্পর্ককে কোনো মতেই উপেক্ষা বা অস্বীকার করা যায় না। কারণ কর্তৃত্ব হল ক্ষমতা ও বৈধতার সমন্বিত রূপ। কেবল বলপ্রয়োগের মাধ্যমে দীর্ঘকাল ধরে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। তাই সামরিক অভ্যুত্থান বা অন্য কোনো অবৈধ উপায়ে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিও নিজের ক্ষমতাকে বৈধতা দানের জন্য প্রহসনমূলক নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন।

ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রসঙ্গে Norman Barry-র বিশ্লেষণ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। Barry তাঁর *An Introduction to Modern Political Theory* গ্রন্থে বলেছেন, "Power is a sociological concept while authority is a philosophical concept" অর্থাৎ ক্ষমতা হল একটি সমাজতাত্ত্বিক ধারণা। ক্ষমতার সঙ্গে সাধারণভাবে যে প্রশ্নগুলি জড়িত থাকে সেগুলি হল ক্ষমতা কার হাতে রয়েছে? অর্থাৎ তার সামাজিক পরিচিতি কী? অন্যদিকে কর্তৃত্ব একটা দার্শনিক ধারণা। কর্তৃত্ব বললেই আমাদের মনে যে প্রশ্নটি আসে সেটি হল ঔচিত্য-অনৌচিত্যের প্রশ্ন। অর্থাৎ যাঁর হাতে ক্ষমতা রয়েছে তাঁর হাতেই কি ক্ষমতা থাকা উচিত? এটি একটি দার্শনিক প্রশ্ন। অন্যভাবে বললে 'power' একটি 'empirical' প্রশ্ন; অপরদিকে 'authority' একটি 'normative' প্রশ্ন।

ক্ষমতার ধারণার মধ্যে যুক্তি (reason)-র কোনো স্থান নেই। কারণ ক্ষমতাবানরা চান বিনা প্রশ্নে তাদের আদেশ প্রত্যেকেই মেনে নিতে বাধ্য হোক। ক্ষমতাবানের আদেশ যুক্তিসঙ্গত কিনা তা বিচার করার অধিকার অন্যদের নেই। কিন্তু কর্তৃত্ব হল যুক্তির সঙ্গে যুক্ত। কর্তৃত্বের মূল কথা হল যুক্তির দ্বারা আস্থাভাজন হয়ে অন্যের স্বেচ্ছা আনুগত্য লাভ করা। আধুনিক রাষ্ট্রে সংবিধানই হল কর্তৃত্বের চরম উৎস। এই সংবিধানই জনগণের সার্বভৌমিকতা নিশ্চিত করে এবং আইনের বৈধতার সৃষ্টি করে। হেগ (Hague) ও হ্যারপ (Harrop)-ও ক্ষমতা ও বৈধতার পার্থক্য করতে গিয়ে বলেছেন "ক্ষমতা হল কাজ করার যোগ্যতা আর কর্তৃত্ব হল এ ধরনের যোগ্যতার অধিকার" ("Where power is the capacity to act, authority is the right to do so.")।

Scanned by CamScanner

গ্রন্থসূত্র:

১। Ball, Allan R., *Modern Politics and Government.*
২। Heywood, Andrew, *Politics.*
৩। Barry, Norman P., *An Introduction to Modern Political Theory.*
৪। চক্রবর্তী, সত্যব্রত, *রাষ্ট্র সমাজ রাজনীতি।*
৫। Wasby, Stephen L., *Political Science: The Discipline and its Dimensions.*

চতুর্থ অধ্যায়

আইন, স্বাধীনতা ও সাম্য— আন্তঃসম্পর্ক (Law, Liberty, Equality – Inter-relationship)

আইন (Law)

একটি সুস্থ, সুশৃঙ্খল, সুসংহত সমাজজীবনের অন্যতম প্রাথমিক শর্ত হল আইন। Andrew Heywood-এর ভাষায়, "Law is the essential guarantee of civilized and orderly existence"। সমাজজীবনের বিভিন্ন নিয়মকানুনকে এক কথায় আইন বলে অভিহিত করা হয়। আইন বিভিন্ন ধরনের। যথা— সামাজিক আইন, নৈতিক আইন বা প্রাকৃতিক আইন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে কিন্তু সংকীর্ণ অর্থে 'আইন' কথাটি প্রয়োগ করা হয়।

দৃষ্টিভঙ্গির বিভিন্নতার জন্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা আইনের বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন। সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে একত্ববাদী ধারণার প্রবক্তা জন অস্টিনের মতে, 'আইন হল সার্বভৌমত্বের নির্দেশ' ('Law is the command of the sovereign.')। তাঁর মতানুসারে আইন হল নির্দিষ্ট রাষ্ট্রনৈতিক ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ রচিত রাষ্ট্রাধীন সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের উপর বাধ্যতামূলকভাবে প্রযুক্ত আদেশ। আইন সম্পর্কে এই ধারণা বিশ্লেষণাত্মক ধারণা (Analytical Concept) বা Command Theory of Law নামে পরিচিত। অস্টিনের ধারণা আরও বিকশিত করেছেন H.L.A. Hart তাঁর ১৯৬১ সালে প্রকাশিত *The Concept of Law* শীর্ষক সুবিখ্যাত গ্রন্থে। হার্ট-এর মতে আইন হল কতকগুলি 'primary' and 'secondary' rules অর্থাৎ প্রাথমিক ও গৌণ বিধির সমন্বয়। প্রাথমিক বিধি বলতে তিনি বুঝিয়েছেন সেই সকল নিয়মাবলি যা মানুষের সামাজিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে, যেমন ফৌজদারি আইন। অন্যদিকে গৌণ বিধি বলতে তিনি বুঝিয়েছেন সেই সকল নিয়মকানুন যা সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিকে বিধি প্রণয়ন করার ক্ষমতা

Scanned by CamScanner

প্রদান করে। অস্টিন সৃষ্ট আইন বিশ্লেষণের ধারাকে 'আইনগত দৃষ্টবাদ' বা 'Legal Positivism' বলা হয়। Legal Positivism-এর সংজ্ঞা দিয়ে Heywood বলেছেন এটি হল "A legal philosophy in which law is defined by the capacity to establish and enforce it, not by its moral character." অর্থাৎ আইনের নৈতিক চরিত্র নয়; সার্বভৌম ক্ষমতার আইনকে প্রয়োগ ও প্রতিষ্ঠা করার সামর্থ্যই হল আইনকে সংজ্ঞায়িত করার মূল মাপকাঠি। সকল রাষ্ট্রবিজ্ঞানী কিন্তু এই তত্ত্বের সঙ্গে একমত নন। অধ্যাপক আরনেস্ট বার্কার (Barker)-এর মতানুসারে আদর্শ আইনের মধ্যে বৈধতা এবং নৈতিক মূল্য উভয়ই থাকা দরকার। তাঁর ভাষায়, "Ideally law ought to have both validity and value. Authority gives validity to law, justice gives it value"। আইনের পিছনে সার্বভৌম রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের সমর্থনকে বৈধতা বলে। আর নৈতিক মূল্য হল এই যে, আইন সামাজিক ন্যায়-নীতিবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে। অবশ্য বার্কার স্বীকার করেছেন যে, আইন বৈধ হলেই সকলে তা মান্য করতে বাধ্য। হেনরি মেইন, দ্যুগুই, ক্র্যাব প্রমুখ লেখকরা ঐতিহাসিক ও সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে আইনকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। বিভিন্ন মতের সমন্বয় ঘটিয়ে উইলসন বলেছেন, আইন হল স্থায়ী আচার-ব্যবহার ও চিন্তাধারার সেই অংশ যা সাধারণ নিয়মাবলি হিসাবে সুস্পষ্ট এবং আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি লাভ করেছে এবং যার পিছনে সরকারের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা বিদ্যমান। অধ্যাপক গেটেলও বলেছেন যে, যে সকল নিয়ম রাষ্ট্র সৃষ্টি, স্বীকার ও বলবৎ করে সেগুলিই আইনে পরিণত হয়। ম্যাকাইভার-এর ভাষায়, "The state is both the child and parent of law." অর্থাৎ আইনের দ্বারাই রাষ্ট্র সৃষ্টি হয় আবার রাষ্ট্রই আইনের উৎস।

আইনের অর্থ ও প্রকৃতি নিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে যথেষ্ট মতপার্থক্য আছে। আইন সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদগুলি নিম্নরূপ:

বিশ্লেষণমূলক মতবাদ: বিশ্লেষণমূলক তত্ত্বের প্রচারক ব্রিটিশ আইনবিদ জন অস্টিন আইনের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন যে, আইন হচ্ছে সমাজের অধস্তনের প্রতি ঊর্ধ্বতনের আজ্ঞা বা আদেশ। এই তত্ত্বের অন্যান্য প্রবক্তাদের মধ্যে রয়েছেন হবস্, বোদাঁ, হল্যান্ড প্রমুখ। এঁদের মতে আইন অমান্য করার অর্থ সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার করা, যার ব্যাপক অর্থ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধাচরণ করা।

ঐতিহাসিক মতবাদ: হেনরি মেইন, মেটল্যান্ড প্রমুখ হলেন এই মতবাদের সমর্থক। ঐতিহাসিক মতবাদ বিশ্লেষণমূলক মতবাদ বা Command Theory-র বিরোধিতা করে বলে যে আইন সার্বভৌমের আদেশ নয়, আইনের জন্ম সামাজিক প্রথার মধ্য দিয়ে। প্রত্যেক রাষ্ট্রেই এমন কিছু রীতিনীতি, প্রথা, সংস্কার, বিধি-নিষেধ থাকে যা ব্যক্তিকে মেনে চলতে হয়, এইসব প্রথা কিন্তু সার্বভৌমের আদেশ নয়।

সমাজতাত্ত্বিক মতবাদ: দ্যুগুই, ক্র্যাব, রসকো পাউন্ড প্রমুখ হলেন এই মতবাদের সমর্থক। রসকো পাউন্ড বলেছেন, "Law is a tool of social engineering"। এঁদের বক্তব্য হল আইন সমাজের কল্যাণসাধন করে বলেই লোকে আইন মান্য করে।

দার্শনিক মতবাদ: দার্শনিক মতবাদের প্রবক্তারা নৈতিক মানদণ্ডে আইনের প্রকৃতি বিচার করেন। দার্শনিক মতবাদের প্রবক্তাদের মধ্যে রয়েছেন অ্যারিস্টটল, হেগেল, বার্কার প্রমুখ লেখকরা। নৈতিক মূল্য বলতে বোঝায় আইনকে সামাজিক ন্যায়-নীতিবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে।

মার্কসীয় মতবাদ: মার্কসীয় মতবাদ অনুসারে আইন হল সমাজের শাসকশ্রেণির স্বার্থবাহী নিয়মকানুন। মার্কস ও এঙ্গেলস বলেন যে, শ্রেণিশাসিত ও শ্রেণিশোষিত সমাজব্যবস্থায় শাসকশ্রেণির ইচ্ছাই আইন রূপে পরিগণিত হয়। অধ্যাপক ল্যাস্কি বলেছেন আইনি ব্যবস্থা হল একটি মুখোশ (Legal order is a mask) যার অন্তরালে প্রভুত্বকারী পুঁজিপতি শ্রেণি তাদের কর্তৃত্ব কায়েম করে। আইনের প্রকৃতি সম্পর্কে মার্কসীয় এই তত্ত্ব অন্যান্য তত্ত্ব থেকে সম্পূর্ণ পৃথক।

আইনের উৎস: সাধারণভাবে বলা যায় যে রাষ্ট্রই হল আইনের স্রষ্টা। তবে বিশেষজ্ঞগণ আইনের কয়েকটি উৎস চিহ্নিত করেছেন:

ধর্ম (Religion): ধর্মীয় ন্যায়নীতি ও নিয়মাবলি অনেক পরিমাণে রাষ্ট্রীয় আইনের ভিত্তি প্রস্তুত করে। ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁর 'সামাজিক প্রবন্ধ'তে বলেছেন যে, প্রাচীন সমাজে ধর্মের সমর্থনে সমস্ত কার্য পরিচালিত হত।

প্রথা (Custom): প্রথা হল আইনের অন্যতম প্রাচীন ও গুরুত্বপূর্ণ উৎস। জনগণের গ্রহণযোগ্যতায় প্রথাগুলি আইনের রূপ নেয়। অবশ্য রাষ্ট্রের স্বীকৃতি ব্যতীত কোনো প্রথাই আইনের রূপ পরিগ্রহ করতে পারে না।

বিচারালয়ের ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্ত (Judicial interpretation and decision): প্রয়োজনবোধে বিচারকগণ আইনের পরিধি বৃদ্ধি করে থাকেন এবং নতুন আইন সৃষ্টি করেন। বিচারক হোমস্ (Justice Holmes) বলেছেন, "Judges do and must make laws"।

ন্যায়বিচার (Justice): গতিশীল সমাজে প্রতিষ্ঠিত আইন অনেক সময় সমাজের ন্যায়বোধের (Idea of Justice) সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় বিচারককে যথেষ্ট চিন্তাভাবনা করে, সচেতনভাবে, ন্যায়বোধ এবং নিরপেক্ষতার ওপর নির্ভর করে বিচারের রায় প্রদান করতে হয়।

বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা (Scientific discussion): আইনের বিবর্তনের আলোকে বিভিন্ন আইনবিদ যে আইনের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপিত করেন, সেইসব আলোচনা,

Scanned by CamScanner

টীকা বা মন্তব্যগুলিও আইনের উৎস বলে পরিগণিত হয়। ইংল্যান্ডে ব্ল্যাকস্টোন, কোক্ প্রমুখ যে টীকা রচনা করেছেন তা আইনে উল্লেখযোগ্য তাৎপর্য পেয়েছে।

আইনসভা (Legislature): বর্তমানে প্রায় প্রতিটি রাষ্ট্রে আইন প্রণয়নের দায়িত্ব আইনসভার হাতে ন্যস্ত থাকে। আধুনিককালে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির প্রসারের ফলে আইনের উৎস হিসাবে আইনসভাই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়ে থাকে।

> **আইনের অর্থ**
>
> উইলসনের মতে, আইন হল প্রতিষ্ঠিত চিন্তাধারা ও আচার-ব্যবহারের একটি অংশ যা বিধি হিসাবে সমরূপতার ছকে একটা রীতিসিদ্ধ ও স্বাতন্ত্র্যের চরিত্র পেয়েছে; এবং সরকারি কর্তৃত্বের স্বীকৃতি পেয়েছে। হল্যান্ড বলেছেন যে, আইন হল একটি সার্বভৌম কর্তৃত্ব কর্তৃক প্রযোজ্য সাধারণ বিধি যা ব্যক্তির বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে (Law is a general rule of external human action, enforced by a sovereign political authority.)।

আইনের প্রকারভেদ

আইনকে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়। আইন সাধারণত দুই প্রকার— (ক) জাতীয় আইন (Municipal Law) এবং (খ) আন্তর্জাতিক আইন (International Law)। জাতীয় আইনকে আবার দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়— (ক) সাংবিধানিক বা শাসনতান্ত্রিক আইন (Constitutional Law) এবং (খ) সাধারণ আইন (Ordinary Law)। সাধারণ আইনকে আবার দুইভাগে বিভক্ত করা হয়, যথা— (ক) সরকারি আইন (Public Law) এবং (খ) ব্যক্তিগত আইন (Private Law)। সরকারি আইনের আবার অনেকগুলি উপবিভাগ আছে। যথা— (ক) শাসন-সংক্রান্ত আইন (Administrative Law), (খ) দেওয়ানী আইন (Civil Law), (গ) ফৌজদারি আইন (Criminal Law) ইত্যাদি। নীচের রূপরেখার দ্বারা আইনের শ্রেণিবিভাগ দেখানো যেতে পারে:

- রাষ্ট্রনৈতিক আইন
  - জাতীয় আইন
    - সাংবিধানিক আইন
    - সাধারণ আইন
      - সরকারি আইন
        - শাসনসংক্রান্ত আইন
        - দেওয়ানি আইন
        - ফৌজদারি আইন
      - ব্যক্তিগত আইন
  - আন্তর্জাতিক আইন

এক নজরে আইনের বৈশিষ্ট্য

- আইন মানুষের বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে।
- আইন হল কতকগুলি বিধিবদ্ধ আচার-আচরণ।
- রাষ্ট্র আইনকে বলবৎ করে। কারণ একমাত্র রাষ্ট্রই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী।
- আইন ভঙ্গ করলে আইন ভঙ্গকারীকে শাস্তি ভোগ করতে হয়।
- আইন হল সর্বজনীন। সমাজে প্রত্যেকের উপর আইন সমভাবে প্রযোজ্য।
- আইন হল সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট।
- আইনের পশ্চাতে সর্বভৌম শক্তির সমর্থন থাকায় আইনের স্থান সবার উপরে।
- আইন ন্যায়সঙ্গত ও মূল্যবোধসম্পন্ন হয়।
- আইন হল আনুষ্ঠানিক (formal)। প্রথার সঙ্গে আইনের এদিক থেকে পার্থক্য রায়েছে।

গ্রন্থসূত্র: বেন এবং পিটারস্ (Benn and Peters): *Social Principles and the Democratic State.*

আন্তর্জাতিক আইন

জাতীয় রাষ্ট্রগুলি তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য যে সমস্ত সর্বসম্মত সাধারণ নিয়মকানুন ও প্রথাগত বিধিকে মেনে চলতে বাধ্য থাকে সেগুলিকেই আন্তর্জাতিক আইন বলে। ওপেনহাইম (Oppenheim) বলেছেন যে, "আন্তর্জাতিক আইন হল সেই সমস্ত নিয়মাবলি যা রাষ্ট্রগুলি পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলকভাবে মেনে নেয়।" আন্তর্জাতিক আইনকে প্রকৃত আইন বলা যায় কিনা সেটি একটি বিতর্কিত প্রশ্ন। অনেকে আন্তর্জাতিক আইনকে 'আইনশাস্ত্রের বিলয় বিন্দু' (Vanishing Point of Jurisprudence) বলে অভিহিত করেছেন। কারণ আন্তর্জাতিক আইনের পিছনে কোনো সার্বভৌম শক্তির সমর্থন নেই ও আইন ভঙ্গ করলে কোনো শাস্তির ভয় নেই। অপরদিকে ওপেনহাইম, কেলসেন, লরেন্স, হল প্রমুখ চিন্তাবিদেরা মনে করেন বিশ্ব শান্তি ও শৃঙ্খলার জন্য আন্তর্জাতিক আইন অপরিহার্য।

স্বাধীনতা (Liberty)

"Liberty is the core value of liberalism"— তাঁর *Politics* শীর্ষক গ্রন্থে এই মন্তব্য করে Andrew Heywood বলেছেন যে যুগে যুগে দার্শনিকেরা তাঁদের সময়ের

Scanned by CamScanner

আলোকে স্বাধীনতার সংজ্ঞা দিয়েছেন। রাজীব ভার্গব ও অশোক আচার্য সম্পাদিত *Political Theory* গ্রন্থে ভি. শ্রীরঞ্জন স্বাধীনতার তিনটি মাত্রার কথা বলেছেন: (১) choice বা পছন্দের ধারণা, (২) absence of restraint বা নিয়ন্ত্রণবিহীনতা এবং (৩) existence conditions অর্থাৎ পছন্দমাফিক কাজ করার পরিস্থিতি।

স্বাধীনতার সংজ্ঞা: ব্যুৎপত্তিগত অর্থে স্বাধীনতার অর্থ হল নিয়ন্ত্রণবিহীনতা (absence of restraints)। জে.এস. মিলের মতে, স্বাধীনতা হল ব্যক্তির চিন্তাধারার অবাধ প্রকাশ। তাঁর মতে, স্বাধীনতা হল ব্যক্তির আত্মকেন্দ্রিক ক্রিয়াকলাপের উপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের অনুপস্থিতি। কিন্তু প্রকৃত অর্থে স্বাধীনতা কখনোই নিয়ন্ত্রণবিহীনতা নয়। বার্কারের মতে, সমষ্টির স্বার্থে ব্যক্তিস্বাধীনতার উপর নিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য। অধ্যাপক ল্যাস্কির মতে, স্বাধীনতা হল এরূপ এক পরিবেশের সংরক্ষণ যেখানে প্রতিটি ব্যক্তি তার অন্তর্নিহিত গুণাবলির প্রকাশ ঘটাতে সক্ষম। কিন্তু এই পরিবেশ সৃষ্টি এবং সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজন রাষ্ট্রীয় আইনের। তাই আইন ও স্বাধীনতা একে অন্যের পরিপূরক। এই দিক থেকে বলা যায় যে, আইন হল স্বাধীনতার শর্ত (Law is the condition of Liberty)। মার্কসীয় দর্শন অনুযায়ী শ্রেণিবিভক্ত সমাজে স্বাধীনতা হল শোষক শ্রেণির স্বাধীনতা, শোষিত শ্রেণির স্বাধীনতা নয়। একমাত্র শোষণমুক্ত সমাজেই সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের প্রকৃত স্বাধীনতাভোগ সম্ভব।

ইংরেজি Liberty শব্দটি লাতিন শব্দ Liber থেকে উদ্ভূত হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। 'Liber' শব্দের অর্থ হচ্ছে মুক্ত (Free)। অর্থাৎ অবাধ অধিকার ভোগ করাই হচ্ছে স্বাধীনতার তাত্ত্বিক তাৎপর্য। তবে অধিকারের সঙ্গে স্বাধীনতার প্রভেদ আছে। অধিকার হচ্ছে ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ এবং স্বাধীনতা হচ্ছে ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপযুক্ত পরিবেশ। অর্থাৎ স্বাধীনতার তাৎপর্য গভীরতা লাভ করে অধিকারের দ্বারা। স্বাধীনতাকে যদি অবাধ ক্ষমতারূপে পরিগণিত করা হয়, তবে সে স্বাধীনতা সমাজের তথা ব্যক্তির মঙ্গলের সহায়ক হবে না বরং ব্যক্তি-মঙ্গলের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে। অধিকার যেমন কর্তব্যের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ, তেমনি স্বাধীনতা যৌক্তিক নিয়ন্ত্রণ (Reasonable restrictions) দ্বারা সীমাবদ্ধ, স্বাধীনতার ওপর আরোপিত নিয়ন্ত্রণই স্বাধীনতাকে পূর্ণতা ও সুষ্ঠু রূপ দান করতে পারে।

রাষ্ট্র ব্যক্তির স্বাধীনতাকে সুরক্ষা করে। তাই রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের মাধ্যমেই ব্যক্তির স্বাধীনতার পূর্ণ রূপায়ণ ঘটে। নিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারিতাকে দূরীভূত করে। ল্যাস্কি প্রসঙ্গত মন্তব্য করেন যে, "By liberty I mean the eager maintenance of that atmosphere in which men have the opportunity to be their best selves." জন স্টুয়ার্ট মিল বাহ্যিক আচরণের স্বাধীনতা অপেক্ষা মানসিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য

স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। মার্কসবাদীগণ অর্থনৈতিক পটভূমিতে স্বাধীনতাকে বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁদের ধারণা একমাত্র সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা ছাড়া অন্য কোনো উৎপাদন ব্যবস্থায় (সমাজে) আপামর জনসাধারণ প্রকৃত স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে না।

স্বাধীনতার রক্ষাকবচ: রাষ্ট্র শাসনের ইতিহাসে লক্ষ করা যায় যে অনেক সময়ই শাসক শ্রেণি স্বাধীনতার অপব্যবহার করে। আবার অনেক সময় সাধারণ মানুষের মধ্যেও স্বাধীনতা ভোগ সম্পর্কে সচেতনতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। তাই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষার জন্য কয়েকটি বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। এগুলিকে স্বাধীনতার রক্ষাকবচ বা 'Safeguards of Liberty' বলা হয়। এই রক্ষাকবচগুলি হল নিম্নরূপ:

(১) আইনের অনুশাসন (Rule of Law): অধ্যাপক ডাইসি আইনের অনুশাসনকে স্বাধীনতার শ্রেষ্ঠ রক্ষাকবচ বলে বর্ণনা করেছেন। আইনের অনুশাসন কথাটির অর্থ হল আইনের প্রাধান্য এবং আইনের চোখে সমতা। এই নীতি অনুযায়ী কেউই আইনের ঊর্ধ্বে নয়। সকলেই সাধারণ আইনের অধীন। রাষ্ট্রের মধ্যে সকলেই সমান স্বাধীনতা ভোগ করবে। অবশ্য মার্কসবাদীগণ মনে করেন যে, আইনের অনুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিলোপ সাধন প্রয়োজন।

(২) লিখিত সংবিধান (Written Constitution): স্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্য লিখিত সংবিধানের প্রয়োজন। সংবিধানে নাগরিকের মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা লিখিত আছে। সংবিধান যেমন স্বাধীনতাকে রক্ষা করে, তেমনি নাগরিক তার স্বাধীনতা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা পেতে পারে সংবিধান লিখিত হলে। আবার, সরকার যদি নাগরিকের অধিকার ভঙ্গ করে, তা হলে নাগরিক প্রতিবিধানের জন্য আদালতের শরণাপন্ন হতে পারে। এই জন্যেই বলা হয়, লিখিত সংবিধান স্বাধীনতার একটি গুরুত্বপূর্ণ রক্ষাকবচ।

(৩) স্বাধীন এবং নিরপেক্ষ বিচার বিভাগ (Independent and Neutral Judiciary): স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ণ রাখার অন্য একটি পদ্ধতি হচ্ছে স্বাধীন এবং নিরপেক্ষ বিচারবিভাগের প্রতিষ্ঠা করা। প্রকৃত যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির বাস্তবায়নের জন্য বিচারবিভাগ স্বাধীনভাবে এবং নিরপেক্ষভাবে বিচারকার্য চালাতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মহাধিকরণ (সুপ্রিম কোর্ট) নাগরিকদের স্বাধীনতার পরিপন্থী যে কোনো আইনকে বাতিল বলে ঘোষণা করতে পারে। অর্থাৎ বিচারবিভাগের মাধ্যমে ব্যক্তির স্বাধীনতাকে রক্ষা করা যায়।

(৪) দায়িত্বশীল সরকার (Responsible Government): দায়িত্বশীল সরকারের অস্তিত্ব থাকলে স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কা থাকে না। কারণ এরূপ শাসনব্যবস্থায়

Scanned by CamScanner

বিরোধী দলের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শাসকগোষ্ঠী বিরোধীদের সমালোচনার ভয়ে তথা বিরুদ্ধ জনমত গঠনের ভয়ে ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে খর্ব করতে উদ্যত হয় না। ভারতের শাসনব্যবস্থা 'দায়িত্বশীল সরকার' শাসনব্যবস্থার একটি প্রকৃত উদাহরণ। জরুরি অবস্থায় ব্যক্তিস্বাধীনতা সঙ্কুচিত হওয়ার জন্য ১৯৭৭ সালের লোকসভা নির্বাচনে তার প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে পড়েছিল বলে অনেকে মনে করেন।

(৫) ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি (Separation of Power): মন্তেস্কু প্রবর্তিত ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতি ব্যক্তিস্বাধীনতাকে রক্ষা করার অন্যতম রক্ষাকবচ। এই নীতির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ— এই তিন বিভাগের যে কোনো একটি বিভাগের হাতে যদি এককভাবে ক্ষমতা অর্পিত হয়, তাহলে স্বাধীনতা খর্ব হতে পারে। সুতরাং ক্ষমতা পৃথগীভূত হওয়া উচিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, মেক্সিকোতে এই নীতি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল, কিন্তু তিনটি বিভাগের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক এতই গভীর যে, ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতিকে পূর্ণভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব হয়নি। তাছাড়া, এই নীতিকে গ্রহণ না করা হলেও স্বাধীনতা রক্ষা করা যায় বলে অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মনে করেন।

(৬) প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র (Direct Democracy): প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র বলতে বোঝায় রাষ্ট্রকার্যে ব্যক্তির সক্রিয় অংশগ্রহণ। সরকার যদি স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করে, তবে জনগণ প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের স্বরূপ অর্থাৎ গণভোট, গণ-উদ্যোগ, পদচ্যুতি ইত্যাদি পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তন করতে পারে। সংক্ষেপে, প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে যেহেতু স্বাধীনতাকে রক্ষা করা যায়, সেহেতু প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রকে স্বাধীনতার রক্ষাকবচ বলা হয়।

(৭) সদাজাগ্রত জনগণ (Alert Public): জনগণ যদি নিজেদের স্বাধীনতা সম্বন্ধে সচেতন হয়, তাহলে নিজেদের স্বাধীনতা তারা নিজেরাই রক্ষা করতে পারে। সচেতনতা থাকলে যেমন একজন অন্য জনের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে পারে না, তেমনি সমষ্টিগতভাবে তারা সরকারের স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে নিজেদের স্বাধীনতাকে রক্ষা করতে পারে। এ প্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধী বলেছেন, যে সমাজ যত ত্যাগ করতে সমর্থ, সেই সমাজ আদর্শের তত শিখরে আরোহণ করতে সমর্থ। পেরিক্লিস বলেছেন, "eternal vigilance is the price of liberty"।

(৮) বিকেন্দ্রীভূত ক্ষমতা (Decentralized Power): বিকেন্দ্রীভূত ক্ষমতা প্রকৃতপক্ষেই স্বাধীনতা সংরক্ষণের সহায়ক। এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় সমস্ত ক্ষমতাই কেন্দ্রের হস্তে বিদ্যমান, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় ক্ষমতা যেহেতু রাজ্যসরকারগুলির হাতেও ন্যস্ত থাকে, সেহেতু এককেন্দ্রিক সরকারের মতো যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের স্বৈরাচারী হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। সুতরাং স্বাধীনতা অব্যাহত রাখার জন্য ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ একান্ত প্রয়োজন।

(৯) স্বাধীন গণমাধ্যম (Free Mass Media): স্বাধীনতার কার্যকারিতা অনেকাংশে নির্ভর করে স্বাধীন গণমাধ্যমের উপর। গণমাধ্যম বলতে সংবাদপত্র, পত্রপত্রিকা, বেতার, দূরদর্শন, ইন্টারনেট প্রভৃতিকে বোঝায়। মিডিয়া— একটি ছোট্ট শব্দ। কিন্তু একটি দেশের গণতন্ত্রের বুনিয়াদ, তার সামাজিক কাঠামো ও শিল্প-অর্থনীতি বিষয়ে প্রধান ভূমিকা পালন করে সে দেশের গণমাধ্যম। গণতন্ত্রের সাফল্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত সংবাদ পরিবেশন ও তথ্য সরবরাহ। আর এই সংবাদ সংক্রান্ত পরিষেবা নিয়েই রাজনৈতিক জগতে মিডিয়ার সগৌরব উপস্থিতি। Information Society বা Network Society-র যুগে স্বাধীনতা সুরক্ষায় গণমাধ্যম বা mass media-র গুরুত্ব অপরিসীম।

(১০) সক্রিয় নাগরিক সমাজ (Active Civil Society): রাষ্ট্র ও পরিবারের মাঝামাঝি একটি স্বাধীন সংঘবদ্ধ ক্ষেত্র হল নাগরিক ও পৌর সমাজ। গ্রামসির মতে রাষ্ট্র হল সম্মতি (Civil Society/আধিপত্য বা হেজিমনি) ও বলপ্রয়োগের এক জটিল সমাহার। পৌর সমাজের মধ্য দিয়ে সম্মতি অর্জনের দ্বারাই শাসকশ্রেণি সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। আজকে তথ্য প্রযুক্তির বিপ্লবের যুগে ইন্টারনেট ও বৈদ্যুতিন গণমাধ্যমের সৌজন্যে নাগরিক সমাজ সক্রিয় হবার এক অভূতপূর্ব সুযোগ খুঁজে পেয়েছে। স্বাধীনতার রক্ষাকবচ হিসেবে আজকের দিনে তাই নাগরিক সমাজের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। স্বাধীনতা সুরক্ষিত করার জন্য প্রয়োজন গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি ও শিক্ষার প্রসার।

ইতিবাচক ও নেতিবাচক স্বাধীনতা প্রসঙ্গে (Berlin's Concept of Positive and Negative Liberty) আইজাইয়া বার্লিন তাঁর সুবিখ্যাত 'Two concepts of Liberty' রচনায় স্বাধীনতা সম্পর্কে আলোচনায় দুটি ধারার উল্লেখ করেন— (১) ইতিবাচক স্বাধীনতা (Positive Liberty) এবং (২) নেতিবাচক স্বাধীনতা (Negative Liberty)। ইতিবাচক স্বাধীনতার ধারণায় বার্লিন স্বশাসন (Self Mastery) এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। এক কথায় এটিকে 'Freedom to' বলা যায়, যেমন Freedom to do something বা কিছু করার অধিকার। বার্লিনের নিজের ভাষায়, "The positive sense of the word 'liberty' derives from the wish on the part of the individual to be his own master . . . I wish to be the instrument of my own, not of other men's acts of will . . ." অর্থাৎ ব্যক্তি নিজেই যখন নিজের উপর প্রভুত্ব করতে চায় সেটি হল ইতিবাচক স্বাধীনতা; আমি নিজেই নিজের ওপর কর্তৃত্ব করব; অন্য কারুর অঙ্গুলিনির্দেশে কাজ করব না।

অন্যদিকে নেতিবাচক স্বাধীনতার ধারাটি উদারনীতিবাদের সঙ্গে যুক্ত। এখানে বাধার অনুপস্থিতি (absence of restraints) এবং ব্যক্তির স্বাধীন পরিসরের উপর জোর দেওয়া হয়। এক কথায় এটিকে 'Freedom from' বলা হয়। Andrew Heywood এই

Scanned by CamScanner

'Freedom to' এবং 'Freedom From' ধারণার পার্থক্যকে সমালোচনা করেছেন ("The 'Freedom From' and 'Freedom to' distinction is misleading")। কারণ একই স্বাধীনতাকে দু'ভাবে দেখা যেতে পারে। যেমন 'ক্ষুধা থেকে নিবৃত্তি' বা Freedom from hunger যদি আমরা বলি তাহলে সেটি হবে নেতিবাচক স্বাধীনতা। এটিকেই আবার 'Right to food' বা খাদ্য পাবার অধিকার হিসেবে ইতিবাচক স্বাধীনতা হিসেবে দেখা যায়।

স্বাধীনতার প্রকারভেদ

'রাষ্ট্র' দার্শনিকেরা বিভিন্ন প্রকার স্বাধীনতার মধ্যে পার্থক্য করেছেন। অধ্যাপক আর্নেস্ট বার্কার তাঁর *Principles of Social and Political Theory* গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, "If liberty and law do not quarrel, liberty may quarrel with itself." অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকার স্বাধীনতা যথা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা (Economic Liberty), রাজনৈতিক স্বাধীনতা (Political Liberty), পৌর স্বাধীনতা (Civic Liberty) প্রভৃতি স্বাধীনতার মধ্যে সংঘর্ষ বাধতে পারে। খুব অল্প মজুরি দিয়ে আমি একজন অর্থনৈতিক দিক থেকে অভাবী মানুষকে কোনো কাজে নিযুক্ত করে আমার চুক্তি করার স্বাধীনতা বা Civil Liberty প্রয়োগ করতে পারি। কিন্তু এটি ওই ব্যক্তির অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্থাৎ ন্যূনতম মজুরি পাবার অধিকারকে লঙ্ঘন করতে পারে।

স্বাধীনতাকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ভিন্ন পটভূমিতে আলোচনা করেছেন, ফলে স্বাধীনতার রূপ-ও বিভিন্ন প্রকার হয়েছে।

(ক) ব্যক্তিগত ও সম্প্রদায়গত স্বাধীনতা: সম্প্রদায়গত স্বাধীনতাকে বর্তমানে জাতীয় স্বাধীনতা বলে উল্লেখ করা হয়। গ্রিক সভ্যতায় ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও সম্প্রদায়গত স্বাধীনতা একই অর্থে ব্যবহৃত হত। জাতীয় স্বাধীনতার অর্থ হচ্ছে রাষ্ট্রের ওপর থেকে বহিঃশক্তি বা অন্য রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণবিহীনতা। রাষ্ট্রের ওপর বৈদেশিক প্রভুত্ব কায়েম থাকলে যেহেতু সমগ্র জাতি পরাধীনতার নাগপাশে আবদ্ধ থাকে, সেহেতু ব্যক্তির কোনো ব্যক্তিস্বাধীনতা থাকে না। তাই বলা হয়, অন্যান্য স্বাধীনতার ভিত্তিভূমি হচ্ছে জাতীয় বা সম্প্রদায়গত স্বাধীনতা। বার্নস্ উল্লেখ করেছেন, "Liberty of the group is regarded as the basis for all natural development of the country or the race." উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ভারত যখন পরাধীন ছিল, তখন ভারতীয়দের সামাজিক, রাজনৈতিক বা পৌর স্বাধীনতা ছিল না। অর্থাৎ জাতীয় স্বাধীনতা না থাকলে ব্যক্তিস্বাধীনতার অস্তিত্ব থাকে না।

(খ) পৌর স্বাধীনতা বা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা: পৌর স্বাধীনতা বা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা গণতন্ত্রের ভিত্তিস্বরূপ। সমাজের মধ্যে থেকে ব্যক্তি পৌর স্বাধীনতা ভোগ করে থাকে। পৌর স্বাধীনতাই ব্যক্তির সামাজিক-মানসিকতার উৎকর্ষ সাধন করে। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ব্যক্তি যেসব পৌর স্বাধীনতা ভোগ করে থাকে, তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল— বাক্ স্বাধীনতা, সভা-সমিতি গঠনের স্বাধীনতা, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, আইনের চোখে সমতার স্বাধীনতা, ধর্মের স্বাধীনতা ইত্যাদি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ব্যক্তির পৌর স্বাধীনতা অবাধ নয়। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ গোলযোগের সময়, যুদ্ধকালীন অবস্থায় অথবা জরুরি অবস্থা চলাকালীন রাষ্ট্র-সংহতি রক্ষার জন্য ব্যক্তির হাত থেকে রাষ্ট্র অধিকারগুলি তুলে নিতে পারে।

রাজনৈতিক স্বাধীনতা: রাষ্ট্রকার্যে অংশগ্রহণের জন্য স্বাধীনতার প্রয়োজন হয়, সাধারণভাবে সেই স্বাধীনতাই হচ্ছে রাজনৈতিক স্বাধীনতা। অতীতে রাজতন্ত্রে মানুষ এই স্বাধীনতা ভোগ করত না। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নাগরিক পরোক্ষভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করে। তাই নির্বাচন ও নির্বাচিত হওয়ার স্বাধীনতা, ভোটদানের স্বাধীনতা ইত্যাদি স্বাধীনতাকে বলা হয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মহান আদর্শ। পৌর স্বাধীনতার সঙ্গে রাজনৈতিক স্বাধীনতার কোনো বৈপরীত্য নেই, বরং তারা একে অপরের পরিপূরক। যেমন, একজন নাগরিকের ভোটদানের স্বাধীনতা আছে। কিন্তু তার যদি বাক্-স্বাধীনতা বা মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা না থাকে, তবে, তার প্রথম স্বাধীনতাটি অর্থাৎ রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্থহীন হয়ে পড়বে। অনুরূপভাবে রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে নাগরিক যত সচেতনভাবে ভোগ করবে, ততই তার পৌর স্বাধীনতা অর্থবহ হয়ে উঠবে।

(ঘ) অর্থনৈতিক স্বাধীনতা: সমাজ বিকাশের বিভিন্ন স্তরে ব্যক্তি বিভিন্ন স্বাধীনতা অর্জন করেছে। যেমন, ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নাগরিকের সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা স্বীকৃতি পেয়েছে। কিন্তু অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছে। মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে বলা হয়, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না থাকলে অন্যান্য স্বাধীনতা অর্থহীন। যেমন, বেকারত্বের গ্লানি অন্যান্য স্বাধীনতাকে অর্থহীন করে তোলে। তাই অর্থনৈতিক স্বাধীনতা হল নাগরিকের মূল ও প্রধান স্বাধীনতা। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বলতে বোঝায় নাগরিকের কর্মের অধিকার, অবকাশ যাপনের অধিকার, অর্থনৈতিক অভাবের দূরীকরণ ইত্যাদি।

উপরিউক্ত স্বাধীনতাগুলি ছাড়াও বাকুনিন প্রমুখ নৈরাজ্যবাদীগণ প্রাকৃতিক স্বাধীনতা এবং গ্রীন প্রমুখ ভাববাদী দার্শনিকগণ নৈতিক স্বাধীনতার কথা বলেছেন।

Scanned by CamScanner

স্বাধীনতা সম্পর্কে মার্কসীয় ধারণা

স্বাধীনতা সম্পর্কে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায় যদি আমরা মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গিটি উপেক্ষা করি। মার্কসীয় স্বাধীনতা তত্ত্বে আবশ্যিকতা (necessity) থেকে স্বাধীনতার রাজ্যে উল্লম্ফনের (Leap from necessity to freedom) কথা বলা আছে। এঙ্গেলস্ তাই বলেছেন, "Freedom is the appreciation of necessity"।

রাষ্ট্রচিন্তার জগতে স্বাধীনতা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ রয়েছে। অমার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে স্বাধীনতা হল একটি রাজনৈতিক সমস্যা এবং সমাজবিচ্ছিন্ন একটি ধারণা। কিন্তু মার্কসীয় দর্শন বৃহত্তর সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে স্বাধীনতার ধারণাটিকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে। মার্কসীয় দর্শন অনুযায়ী উৎপাদনের উপকরণের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা কখনোই সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের স্বাধীনতার ধারণাকে সুনিশ্চিত করতে পারে না। উৎপাদনের উপকরণের উপর সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবার পরই সংখ্যাগরিষ্ঠ ব্যক্তি সর্বাঙ্গীণ বিকাশের সুযোগ পায়। এই সর্বাঙ্গীণ বিকাশের সুযোগকে স্বাধীনতা বলা যায়। একটি সমাজে অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হলেই প্রকৃত স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। সংক্ষেপে, মার্কসীয় দর্শন অনুযায়ী মানুষ যখন বৈষয়িক জীবনের ঠিকানা সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন করে এবং উৎপাদনের শক্তির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে তার বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হয়, তখনই প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জিত হতে পারে। স্বাধীনতা সম্পর্কে মার্কসীয় ধারণা বস্তুবাদী দর্শনের উপর নির্ভরশীল। এঙ্গেলসের মতে, ঐতিহাসিক বস্তুবাদের মাধ্যমে মার্কসবাদ স্বাধীনতাকে বোঝাবার চেষ্টা করে।

বুর্জোয়া দৃষ্টিকোণের সঙ্গে তুলনা করলে **মার্কসীয় দর্শনে স্বাধীনতা সম্পর্কিত ধারণার মধ্যে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য** লক্ষ করা যায়।

প্রথমত, বুর্জোয়া দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী ব্যক্তির কাজকর্মের উপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের অনুপস্থিতি এবং সরকারের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা হল স্বাধীনতা। এই অর্থে স্বাধীনতার ধারণা নেতিবাচক। কিন্তু মার্কসবাদ অনুযায়ী সকল সমাজেই সরকারি এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা স্বাধীনতার বিরোধী নয়। শ্রেণিবিভক্ত সমাজের পরিবর্তে শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হলে প্রকৃত ব্যক্তিস্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব বলে মার্কসবাদীরা মনে করেন। এই কারণে মার্কসবাদীদের বক্তব্য হল যে, "Freedom is not Political but Social . . ."।

দ্বিতীয়ত, মার্কসবাদ মনে করে, যতক্ষণ মানুষের জীবন তার ইচ্ছা নিরপেক্ষ প্রাকৃতিক নিয়মের দ্বারা শাসিত হবে, ততদিন সে স্বাধীন হতে পারে না। এক ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই আবশ্যিকতার সীমাবদ্ধতাকে কাটিয়ে উঠে স্বাধীনতার রাজ্যে প্রবেশ করা সম্ভব। মার্কসীয় ধারণা অনুসারে সাম্যবাদী সমাজেই এই স্বাধীনতার রাজ্যের বাস্তবায়ন সম্ভব।

বুর্জোয়া সমাজে বিচ্ছিন্নতা, পুঁজির দাপট সবকিছুই মানুষকে বিশেষত শ্রমজীবীদের দাসে পরিণত করে। এই দাসত্ব বা পুঁজির অধীনতার অবস্থায় যথার্থ স্বাধীনতা সম্ভব নয়। হার্বার্ট আপথেকার (Herbert Apthekar) তাঁর The Nature of Democracy, Fredom and Revolution গ্রন্থে বলেছেন, স্বাধীনতার জন্য প্রয়োজন একটি মুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার। একমাত্র সাম্যবাদী সমাজেই মজুরি শ্রম (wage labour), বিচ্ছিন্নতা (alienation), অর্থনৈতিক বৈষম্য ও শোষণজাত অসামর্থ্যের সীমাবদ্ধতা ও প্রতিবন্ধকতাসমূহ থেকে মানুষ মুক্ত হতে পারে। তাই ভবিষ্যতের সাম্যবাদী সমাজেই স্বাধীনতার রাজ্য বাস্তবায়িত হয়ে উঠবে।

এক নজরে স্বাধীনতার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়

- অধ্যাপক ল্যাস্কির মতে স্বাধীনতা হল এরূপ এক পরিবেশের সংরক্ষণ যেখানে প্রতিটি ব্যক্তি তার অন্তর্নিহিত গুণাবলির প্রকাশ ঘটাতে সক্ষম।
- আইন ও স্বাধীনতা একে অন্যের পরিপূরক। এই দিক থেকে বলা যায় আইন হল স্বাধীনতার শর্ত।
- স্বাধীনতার রক্ষাকবচসমূহের মধ্যে রয়েছে (ক) আইনের অনুশাসন, (খ) লিখিত সংবিধান, (গ) স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচারালয়, (ঘ) দায়িত্বশীল সরকার, (ঙ) ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি, (চ) প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র, (ছ) সদাজাগ্রত জনমত, (জ) বিকেন্দ্রীকরণ ও (ঝ) স্বাধীন গণমাধ্যম ও সক্রিয় পৌর সমাজ।
- আইজাইয়া বার্লিন নেতিবাচক স্বাধীনতা (Negative Liberty) ও ইতিবাচক স্বাধীনতা (Positive Liberty)-র মধ্যে পার্থক্য করেছেন।
- মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী একমাত্র শোষণমুক্ত সাম্যবাদী সমাজেই প্রকৃত স্বাধীনতা ভোগ সম্ভব।

আইনের সঙ্গে স্বাধীনতার সম্পর্ক (Relation between Law and Liberty)

অধ্যাপক ল্যাস্কির মতে "স্বাধীনতার অর্থ প্রতিটি ব্যক্তি যাতে আত্মবিকাশের সুযোগ পায় এমন পরিবেশ রক্ষা করা" ("By liberty I mean the eager maintenance of that atmosphere in which men have the opportunity to be their best selves.")। ব্যক্তিত্ব বিকাশের এই সুযোগসুবিধাগুলিকেই অধিকার বলে। এই অর্থে স্বাধীনতা হল অধিকারের ফল।

স্বাধীনতা যদি অধিকারের ফল হয় তবে স্বাধীনতাকে আইনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে। রাষ্ট্রীয় আইনের দ্বারা সৃষ্ট পরিবেশের মধ্যেই প্রকৃত স্বাধীনতা ভোগ করা সম্ভব। অধ্যাপক বার্কার বলেছেন, "রাষ্ট্রের মধ্যে স্বাধীনতা বা আইনসম্মত স্বাধীনতা কখনোই কারও অবাধ স্বাধীনতা হতে পারে না, এ হল সর্বদা সকলের জন্য শর্তসাপেক্ষ স্বাধীনতা।" বার্কারের ভাষায়, "The truth that every man has to be free has for its other side the complementary and consequential truth that no man can be absolutely free"। আর এখানেই স্বাধীনতা যাতে স্বেচ্ছাচারিতায় রূপান্তরিত না হয় তা সুনিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজন রাষ্ট্রীয় আইনের।

গ্রে (Gray)-ও একইভাবে বলেছেন স্বাধীনতা বলতে আমরা মনে করি না যে অনিয়মিতভাবে যা খুশি তা করা বরং স্বাধীনতা হল এমন এক পরিবেশ যেখানে মানুষের ব্যক্তিত্বের চরম বিকাশ ঘটা সম্ভব। এই পরিবেশ একমাত্র রাষ্ট্রীয় আইন সংরক্ষণ করতে পারে। স্বাধীনতা কখনোই সমাজ নিরপেক্ষ হতে পারে না।

আইন বলতে বোঝায় রাষ্ট্রের সার্বভৌম কর্তৃত্ব ব্যক্তির বাহ্যিক আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আরোপিত বিধি-নিষেধের সমষ্টি। অর্থাৎ আইন ব্যক্তির বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। স্বাধীনতা বলতে বিশেষ এক পরিবেশের সংরক্ষণকে বোঝায় যার মাধ্যমে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকশিত হতে পারে। অর্থাৎ স্বাধীনতা হচ্ছে সেই সব সুযোগ-সুবিধা যা ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহায়ক।

অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মনে করেন যে, আইন এবং স্বাধীনতা পরস্পরবিরোধী ধারণা। জন স্টুয়ার্ট মিল, স্পেনসার প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর মতে, একটির উপস্থিতি অন্যটির অনুপস্থিতি ঘটায়। যেখানে আইন আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে, সেখানে ব্যক্তির স্বাধীনতা আইনের যূপকাষ্ঠে বলি হয়। আবার যেখানে স্বাধীনতা থাকে, সেখানে আইনের কঠিন-কঠোর প্রাচীর ভেঙে পড়ে। লর্ড ব্রাইসের (Lord Bryce) মতে উভয়ের মধ্যে যে কোনো একটির তীব্রতা অন্যটিকে স্তিমিত করে দেয়। আইন এবং স্বাধীনতা উভয়ের ওপরই রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব বিদ্যমান। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীগণ মনে করেন যে, ব্যক্তিস্বাধীনতা স্ফুরণের জন্য তথা সমাজ-মঙ্গলের জন্য রাষ্ট্রের কর্তৃত্বকে সঙ্কুচিত করা প্রয়োজন। তাঁদের মতে, ব্যক্তিই মুখ্য, রাষ্ট্র গৌণ, ব্যক্তিসমষ্টি নিয়েই রাষ্ট্র। সুতরাং আইন প্রণয়ন করে ব্যক্তিস্বাধীনতাকে খর্ব করা রাষ্ট্রের কখনোই উচিত নয়। নৈরাজ্যবাদীগণও রাষ্ট্রের বিলুপ্তির কথা প্রচার করেছেন।

কিন্তু স্বাধীনতার ওপর যদি যৌক্তিক নিয়ন্ত্রণ না থাকে, তবে সেই স্বাধীনতা হবে স্বেচ্ছাচারিতার নামান্তর, এবং রাষ্ট্র হয়ে পড়বে দুর্নীতির আধার। সমাজে দুর্বলের ওপর বলশালী অবাধ নির্যাতন চালাতে পারে; শক্তিশালী রাষ্ট্র দুর্বল রাষ্ট্রগুলির ওপর সাম্রাজ্যবাদের কালো হাত প্রসারিত করতে পারে। ফলে শাসনব্যবস্থা 'জোর যার মুলুক

তার' নীতিতে পর্যবসিত হয়ে পড়বে। কিন্তু আধুনিক জনকল্যাণকামী রাষ্ট্র 'গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, সাম্য'-এর নীতিতে বিশ্বাসী। সমাজে প্রত্যেকে যাতে স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে, একজন যাতে অপরের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না করতে পারে, তার জন্যই রাষ্ট্র স্বাধীনতার ওপর বিধি-নিষেধ আরোপ করে বা আইনের মাধ্যমে স্বাধীনতাকে খর্ব করে না, বরং স্বাধীনতা ভোগে সাহায্য করে। সুতরাং আইন ও স্বাধীনতা পরস্পরবিরোধী নয়, বরং পরিপূরক। এদিক থেকে বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে, সার্বভৌম বা রাষ্ট্রের কর্তৃত্বও স্বাধীনতার বিরোধী নয়, বরং স্বাধীনতা রক্ষার অতন্দ্র প্রহরীরূপে কাজ করে। আইনের সঙ্গে স্বাধীনতার সম্পর্কটি আরও কয়েকটি দিক থেকে আলোচনা করা যেতে পারে।

প্রথমত, আইন ব্যক্তির স্বাধীনতাকে রক্ষা করে। একজনের স্বাধীনতায় যদি অন্যজন অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করে, তবে রাষ্ট্রের আইন শেষোক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে পারে। যেমন, সম্পত্তির অধিকার ব্যক্তির আছে। কোনো ব্যক্তি যদি অন্যায়ভাবে তা আত্মসাৎ করার চেষ্টা করে, তবে আইন শেষোক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

দ্বিতীয়ত, শাসকের স্বৈরাচারিতার উদ্ধত খড়্গ যেন ব্যক্তিস্বাধীনতাকে বলি দিতে না পারে, আইন তার ব্যবস্থা করে। শাসক স্বৈরাচারী হয়ে পড়লে এবং স্বাধীনতা বিপন্ন হলে নাগরিক আইনের সাহায্যে পুনরায় তার স্বাধীনতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

তৃতীয়ত, যে পরিবেশের মাধ্যমে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকশিত হতে পারে, সেই পরিবেশকে সুরক্ষা করে আইন। আধুনিক রাষ্ট্র জনহিতকর আইন প্রণয়নের মাধ্যমে ব্যক্তির শিক্ষার স্বাধীনতা, ব্যক্তিস্বাস্থ্য ও জনস্বাস্থ্যের স্বাধীনতা, মাদকদ্রব্য বর্জন ইত্যাদি স্বাধীনতার স্বীকৃতি দিচ্ছে।

চতুর্থত, মৌলিক অধিকারকে রক্ষা করে সাংবিধানিক আইন। সংকটকালীন অবস্থা ব্যতীত অন্য কোনো সময়ে ব্যক্তির মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হলে ব্যক্তি আদালতের রায়ের মাধ্যমে স্বাধীনতাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে পারে।

উপরিউক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান যে, আইনের সঙ্গে স্বাধীনতার সম্পর্ক সুগভীর। অধ্যাপক রিচি বলেন যে, আত্মবিকাশের জন্য যে পরিসর বা পরিবেশের প্রয়োজন সেই পরিবেশের পরিপূর্ণতা আসে আইনের মধ্য থেকেই। আইন একাধারে স্বাধীনতাকে রক্ষা করে এবং তা সম্প্রসারিত করে। সেহেতু স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আইনের প্রয়োজন। আইনের এই ভূমিকাকেই বলা হয় স্বাধীনতার শর্ত (Law is the condition of liberty)। রাষ্ট্রের বিভিন্ন কাজের মধ্যে অন্যতম কাজ হচ্ছে স্বাধীনতার সঙ্গে আইনের মিলন ঘটানো। কিন্তু মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে অর্থনৈতিক বৈষম্য যে সমাজে বিদ্যমান, সে রাষ্ট্র কখনোই দুইয়ের মিলন ঘটাতে পারে না। আইন বা স্বাধীনতা সমাজের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় দ্বারা ও তাদেরই স্বার্থে পরিচালিত হয়। আইন ও স্বাধীনতার বাস্তব রূপায়ণ ঘটে একমাত্র সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায়।

Scanned by CamScanner

স্বাধীনতা ও আইনের প্রকৃত অর্থ নির্ণয়ের প্রশ্নে রাষ্ট্রদার্শনিকদের মধ্যে মতভেদ লক্ষ করা যায়। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ও নৈরাজ্যবাদী চিন্তাবিদগণ সাধারণভাবে আইন ও স্বাধীনতাকে পরস্পর বিরোধী বলে গণ্য করেছেন। অন্যদিকে ভাববাদী ও সামগ্রিকতাবাদী রাষ্ট্রদার্শনিকগণ আইন ও স্বাধীনতাকে পরিপূরক হিসেবে বিবেচনা করেন।

এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক আরনেস্ট বার্কারের অভিমত প্রণিধানযোগ্য। বার্কার তাঁর *Principles of Social and Political Theory* গ্রন্থে আইন ও স্বাধীনতার সম্পর্ক পর্যালোচনা করতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন যে, "My right to swing my arm ends where the other person's nose begins." অর্থাৎ আমার হাত চালিত করবার অধিকার যেন অন্য লোকের শারীরিক ক্ষতি না করে। অর্থাৎ বার্কার বোঝাতে চেয়েছেন অধিকার ভোগের সঙ্গে যেমন কর্তব্যের ধারণা ওতপ্রোতভাবে জড়িত, সেইরূপ স্বাধীনতা সুষ্ঠুভাবে উপভোগ করতে গেলে আইনগত বাধ্যবাধকতা মেনে চলা দরকার। বার্কারের মতে একজনের স্বাধীনতা অন্যদের স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা দ্বারা সীমাবদ্ধ।

ভারতীয় সংবিধানেও ১৯নং ধারায় বলা হয়েছে যে রাষ্ট্র বিভিন্ন প্রয়োজনে ব্যক্তিস্বাধীনতার উপর যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ (reasonable restrictions) আরোপ করতে পারে। সংবিধানে বলা হয়েছে দেশের সার্বভৌমত্ব ও সংহতি, রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, জনশৃঙ্খলা রক্ষা, শিষ্টাচার ও নৈতিকতা, আদালতের অবমাননা প্রতিরোধ ইত্যাদি কারণে রাষ্ট্র বাক্ স্বাধীনতা ও মতপ্রকাশের অধিকারের উপর যুক্তিসঙ্গত নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারে। ভারতীয় সুপ্রিম কোর্টের ভাষায়, "Art. 19 strikes a balance between individual liberty and collective good." অর্থাৎ ১৯নং ধারা ব্যক্তিস্বাধীনতা ও সামগ্রিক কল্যাণের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করেছে।

সাম্য (Equality)

রাজনৈতিক ও নৈতিক আদর্শ হিসেবে বহু শতাব্দী ধরে সাম্যের ধারণা মানব সমাজে মূল চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করেছে। প্রাচীন গ্রিক সভ্যতা থেকে একবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত ব্যাপ্ত ইতিহাসে 'স্বাধীনতা'র মতোই 'সাম্য'র ধারণাকে কেন্দ্র করে মানুষের সর্বাধিক আবেগ সঞ্চারিত হয়েছে। সাম্যের আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষ যুগে যুগে সংগ্রাম করেছে।

রাষ্ট্রচিন্তার জন্মলগ্ন থেকেই যে ধারণাটি চিন্তানায়কদের প্রভাবিত করেছে তা হল সাম্যের ধারণা। গ্রিক স্টোয়িক দার্শনিকরা সব মানুষের সমানাধিকার ও প্রাকৃতিক সাম্যের কথা বলেন। চুক্তিবাদী লক্ ও রুশো মনে করতেন যে প্রাকৃতিক পরিবেশে সব মানুষ সমান ছিল এবং তারা সাম্য ও সমান অধিকারের ভিত্তিতে সুন্দর জীবনযাপন করত। মধ্যযুগের

ইউরোপে নৈতিক সাম্যের দর্শন, সপ্তদশ শতকের ইংল্যান্ডে সাম্যের ধারণাটি বিকশিত হতে দেখা যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসি বিপ্লবের মূল মন্ত্রই ছিল সাম্য ও স্বাধীনতা। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ সাম্য ও স্বাধীনতার দর্শনকে প্রতিষ্ঠা করেছিল একটি নতুন জাতিরাষ্ট্রের আত্মপরিচয়ের স্বাক্ষর হিসাবে।

উনবিংশ শতাব্দীতে সাম্যের ধারণাটিকে পর্যাপ্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়। সমাজতান্ত্রিক এবং উদারনৈতিক পথে সাম্যের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা হয়। সাম্যের প্রকৃতি বিশ্লেষণে সমাজতান্ত্রিক মতবাদে দুটি ভিন্ন পথের সন্ধান পাওয়া যায়। এ দুটি হল কাল্পনিক সমাজতন্ত্র এবং বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র। কাল্পনিক সমাজবাদীরা যেমন সাঁসিমো, রবার্ট ওয়েন, চার্লস ফুরিয়ে প্রমুখ মনে করতেন যে, মানুষ মূলগতভাবে সমান এবং সামাজিক বৈষম্য মনুষ্যসৃষ্ট ও অর্থনৈতিক। সুতরাং সাম্যের ভিত্তিতে রচিত সমাজজীবনই তাদের কাঙ্ক্ষিত স্বর্গরাজ্যে উন্নীত করবে।

সাম্যের প্রকৃতি বিশ্লেষণে কাল্পনিক সমাজবাদীদের খুব নিকটবর্তী হলেন নৈরাজ্যবাদীরা। নৈরাজ্যবাদীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন প্রুধো, বাকুনিন, ক্রপটকিন প্রমুখ। এঁরা মনে করতেন যে মানুষ প্রকৃতিগতভাবে সমান ও সমানাধিকারসম্পন্ন। মানুষের স্বাভাবিক সাম্যের প্রতিবন্ধক হল তিনটি প্রতিষ্ঠান— পরিবার, সম্পত্তি ও রাষ্ট্র। আদর্শ সাম্যভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য এই তিনটি প্রতিষ্ঠানের অবলুপ্তি দাবি করেন নৈরাজ্যবাদী তাত্ত্বিকেরা। সাম্যের লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্য তাঁরা যে কোনো কৌশল অবলম্বন করার কথা বলেন।

কাল্পনিক সমাজবাদ এবং নৈরাজ্যবাদীদের ধারণার বিপরীত হল মার্কস ও এঙ্গেলসের বৈজ্ঞানিক সমাজবাদ। তাঁদের মতে, উৎপাদন প্রক্রিয়ার চরিত্রগত পরিবর্তনের মাধ্যমে সমাজ বিকশিত হয়। এই তত্ত্ব অনুযায়ী শ্রেণি কাঠামোর পরিবর্তনশীল বিন্যাসের মাধ্যমে সমাজ ব্যবস্থার চরিত্র নির্ধারিত হয়। সাম্যবাদের পর্যায়ে রাষ্ট্রের কোনো প্রয়োজনীয়তা থাকবে না এবং সে আপনা থেকেই বিলুপ্ত হয়ে যাবে। সেই বিশেষ ঐতিহাসিক পর্যায়ে মানুষ ফিরে পাবে তার সাম্যবাদী নির্যাস। সুতরাং সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা ব্যতীত প্রকৃত সাম্য প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নয়।

উদারনৈতিক ধারণা অনুযায়ী সাম্য মূলত সামাজিক ও রাজনৈতিক। অধ্যাপক বার্কারের মতে, সাম্য হল ন্যায়ের দ্বারা পরিচালিত সামাজিক অধিকার বণ্টনের এক পদ্ধতি। সাম্য একটি নৈতিক বিধি যা সকলের অধিকারকে সুনিশ্চিত করে। উদারনৈতিক তত্ত্বের সমর্থকদের মধ্যে কয়েকজন অবশ্য নৈতিক ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠার বিষয়টিকে গুরুত্ব দেবার পক্ষপাতী। অর্থনৈতিক সাম্যকে প্রাপ্য গুরুত্ব দিলে তবেই সামাজিক স্তরে আইনগত সাম্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব বলে তাঁরা মনে করেন।

Scanned by CamScanner

অধ্যাপক ল্যাস্কির ধারণা অনুযায়ী সাম্য হল বিশেষ সুযোগ সুবিধার অনুপস্থিতি। রাষ্ট্র সবাইকে পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা দেবে যার মাধ্যমে অন্তর্নিহিত গুণাবলি বিকাশের সুযোগ পাওয়া সম্ভব হয়। ল্যাস্কির মতে, সমাজের লাভের অংশ কীভাবে সমাজস্থ সকলের মধ্যে সমানভাবে বণ্টন করা যায় সেটি সাম্যের ধারণার একটি জটিল সমস্যা। সমাজের মধ্যে একটি আপেক্ষিক সাম্য (Relative Equality) থাকা প্রয়োজন বলে ল্যাস্কি মনে করেন। তবে সাম্যের ধারণাটি যে মূলত অর্থনৈতিক, সে ব্যাপারে ল্যাস্কির কোনো দ্বিধা ছিল না।

ল্যাস্কি তাঁর A Grammar of Politics গ্রন্থে সাম্য বলতে তিনটি নীতির উল্লেখ করেছেন। এগুলি হল:

- বিশেষ সুযোগ সুবিধার অনুপস্থিতি (absence of special privilege)
- সকলের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা (adequate opportunities for all) এবং
- ন্যূনতম মৌলিক অধিকারগুলি পূরণের সুযোগ।

বার্কারের মতে সাম্য বলতে সকলের জন্য সমজাতীয় ব্যবস্থা বোঝায় না। তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেছেন, "আমরা সকলে দৌড় শুরুর আগে যেমন একটা সমান্তরাল রেখায় দাঁড়িয়ে থাকি, তেমনি রাষ্ট্র স্বীকৃত সমান সুযোগ সুবিধার সাহায্যে ব্যক্তিত্বের সম্ভাব্য বিকাশের জন্য একই রেখায় আমরা দাঁড়িয়ে আছি। সুতরাং সাম্য হল শুরু, শেষ নয়।"

উদারপন্থী চিন্তানায়কেরা যেমন বার্কার, ল্যাস্কি, ব্রাইস প্রমুখ সাম্যের ধারণাকে নানাভাগে বিভক্ত করেছেন। বস্তুত সাম্যের ধারণাটি এমনই ব্যাপক ও বহুমুখী যে তার একাধিক শ্রেণিবিভাগ করা সম্ভব। সাধারণত তিনভাগে সাম্যের শ্রেণিবিভাগ করা যেতে পারে। যেমন— (১) স্বাভাবিক সাম্য, (২) আইনগত সাম্য, (৩) পৌর বা সামাজিক সাম্য।

(১) স্বাভাবিক সাম্য (Natural Equality): স্বাভাবিক সাম্যের মূল কথা হল প্রকৃতিগতভাবে সব মানুষ সমান। প্রাকৃতিক সম্পদের উপর সকলেরই সমানাধিকার রয়েছে। প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের ধারণার বিরোধিতা করে স্টোয়িক দার্শনিকগণ স্বাভাবিক সাম্যের ধারণার অবতারণা করেছিলেন। এই প্রকার সাম্যের প্রবক্তারা সমাজে কৃত্রিম মনুষ্যসৃষ্ট বৈষম্যকে দূর করতে চেয়েছেন।

(২) আইনগত সাম্য (Legal Equality): আইনগত সাম্যের মূল কথাই হল আইনের অনুশাসন। আইনের শাসনের মূল কথাই হল আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান ও সমপর্যায়ভুক্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে আইন সমানভাবে প্রযোজ্য হবে। আইনগত সাম্যের তিনটি নির্দিষ্ট রূপ রয়েছে: (ক) ব্যক্তিকেন্দ্রিক সাম্য, (খ) রাজনৈতিক সাম্য ও (গ) অর্থনৈতিক সাম্য।

(ক) ব্যক্তিকেন্দ্রিক সাম্য : গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সংবিধানে নির্দিষ্ট করা আছে যে ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, জন্মস্থান, আর্থিক অবস্থান ইত্যাদি নির্বিশেষে সব মানুষই আইনের চোখে সমান ও আইনের দ্বারা ক্ষমতাকে সংরক্ষিত করার অধিকারী।

(খ) রাজনৈতিক সাম্য: রাজনৈতিক সাম্য হল ব্যক্তিকেন্দ্রিক সাম্যের পরিপূরক। একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, আর্থিক অবস্থান নির্বিশেষে সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের অধিকার রয়েছে সরকারি কাজে অংশগ্রহণের। এছাড়া সরকারকে নির্বাচন করার অধিকার নাগরিকের আছে। 'One Person one Vote'— এই আদর্শটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করেছে।

(গ) অর্থনৈতিক সাম্য: মূলত সমাজতান্ত্রিক মতবাদের প্রবক্তারা অর্থনৈতিক সাম্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করার পক্ষপাতী। তাঁদের মতে, উদারনৈতিক ব্যবস্থায় সামাজিক ও রাজনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হলেও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রকট বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। এইজন্য সমাজতান্ত্রিক মতবাদের প্রবক্তারা উৎপাদনের উপায়সমূহের উপর ব্যক্তিগত মালিকানার পরিবর্তে প্রথম পর্যায়ে রাষ্ট্রীয় মালিকানা ও তারপর সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠার কথা বলেন। রাষ্ট্রীয় আইনের পদ্ধতিগত প্রক্রিয়ার মাধ্যমেও মালিকানার এই চরিত্রগত পরিবর্তন করতে হবে। তবেই অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে।

(৩) পৌর বা সামাজিক সাম্য: সামাজিক সাম্য বা পৌর সাম্য বলতে বোঝায় এই যে পুর সামাজিক স্তরে প্রতিটি ব্যক্তি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ ইত্যাদি নির্বিশেষে সমান ক্ষমতা ও মর্যাদা ভোগ করবে। বাস্তবে এটি সম্ভব নয়। সমাজের সর্বস্তরেই একটি কৃত্রিম পুরুষ-সৃষ্ট বৈষম্য রয়েছে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে কখনোই নারী ও পুরুষকে সমমর্যাদাভুক্ত বলে গণ্য করা হয়নি। এছাড়া, আর্থিক অবস্থানের ভিত্তিতে সামাজিক স্তরবিন্যাস রয়েছে যা সাম্য প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়াকে বাধা প্রদান করছে। পুর সমাজের সর্বস্তরে সামাজিক স্তরবিন্যাসের উপস্থিতি সাম্যের পরিবেশকে কলুষিত করেছে।

অধ্যাপক জোহারী এগুলি ছাড়াও আন্তর্জাতিক সাম্য বা International Equality-র কথা বলেছেন। রাষ্ট্র সংঘের সদস্য হিসাবে তাই প্রত্যেক রাষ্ট্র সাধারণ সভায় একটি ভোট দানের অধিকারী। এটিকে 'Sovereign Equality' বলা হয়।

অধ্যাপক অশোক আচার্য বলেছেন যে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক দর্শনের চর্চায় 'কীসের সাম্য?'— এই বিতর্কটি নতুন মাত্রা লাভ করেছে ("In contemporary political philosophy, a lot of discussion surrounds the 'equality of what' debate" — Ashok Acharya in Rajeev Bhargava and Ashok Acharya (eds.) *Political Theory*)।

- হিতবাদী বা উপযোগিতাবাদী দার্শনিকেরা যথা জেরিমি বেন্থাম কল্যাণ ব্যবস্থার সাম্য বা equality of welfare-এর ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। বেন্থামের নীতি হল 'সর্বাধিক মানুষের সর্বাধিক কল্যাণ' (greatest good of the greatest number)।
- অন্যদিকে জন রলস্ (John Rawls), রোনাল্ড ডৌরকিন (Ronald Dworkin), এরিক রাকাউস্কি (Eric Rakowski) প্রমুখ লেখকগণ সম্পদের সমবন্টন বা equality of resources-এর উপর গুরুত্ব দিয়েছেন।
- অধ্যাপক অমর্ত্য সেন সামর্থ্যের সাম্য বা equality of capabilities-এর ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর মতে মানুষের চাহিদা বা দাবির মধ্যে যখন বৈচিত্র্য রয়েছে তখন অসাম্য দূরীকরণের কোনো একটি পন্থা সর্বজন প্রযোজ্য নাও হতে পারে। "Social policy must be attuned to facts of human diversity."। মানুষের বহুবিধ চাহিদা ও বৈচিত্র্যকে মাথায় রেখে সামাজিক নীতি নির্ধারণ করতে হবে।

সাম্য বিতর্কে একটি উল্লেখযোগ্য অবদান হল মাইকেল ওয়ালজার (Michael Walzer)-এর 'Complex Equality' সংক্রান্ত ধারণা। তাঁর মতে বণ্টনগত সাম্য বা distributional equality শুধুমাত্র কল্যাণ (welfare), সম্পদ (resources) বা সামর্থ্যের (capabilities) ভিত্তিতে পর্যালোচনা করলে হবে না। সাম্য একটি গতিশীল ধারণা। সমাজের বৈচিত্র্যের আলোকে সাম্যকে দেখা উচিত। "Equality requires a diversity of distributive criteria that mirrors the diversity of social goods"। তিনি বণ্টনের ক্ষেত্রে বহুত্ববাদী দৃষ্টিভঙ্গির পক্ষপাতী (Walzer, *Spheres of Justice: A Defence of Pluralism and Equality*)।

স্বাধীনতা ও সাম্যের সম্পর্ক (Relation between Liberty and Equality)

যুগ যুগ ধরে মানুষের বহু সংগ্রামের ফলশ্রুতি হিসাবে স্বাধীনতা ও সাম্যের আদর্শ বিকশিত হয়েছে। স্বাধীনতা ও সাম্যের দাবি সব থেকে প্রবলভাবে উচ্চারিত হয় ১৭৮৯ সালে ফরাসি বিপ্লবের ঘোষণাপত্রে: "All human beings are born free and equal in dignity and rights"।

তবে স্বাধীনতা ও সাম্যের সম্পর্ক নিয়ে দু'ধরনের মতামত লক্ষ করা যায়। বিষয়টিকে নিম্নলিখিতভাবে উপস্থাপিত করা যায়:

সাম্য ও স্বাধীনতা পরস্পর বিরোধী: সাম্য ও স্বাধীনতার আন্তঃসম্পর্ক বিষয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতবিরোধ লক্ষ করা যায়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে একটি বৃহৎ অংশ মনে করেন যে সাম্য ও স্বাধীনতা পরস্পরের পরিপন্থী। সাম্যের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হলে ব্যক্তিস্বাধীনতা বিপন্ন হতে পারে। সাম্য হল স্বাধীনতার শত্রু। সকলের প্রতি সমান ব্যবহার করলে যে অধিকতর যোগ্য, উদ্যোগী বা পরিশ্রমী তার কৃতিত্বকে ছোটো করা হয় ও তার স্বাধীনতা খর্ব করা হয়। লর্ড অ্যাকটন, টকভিল প্রমুখ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী চিন্তানায়কেরা এরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তাঁরা মনে করেন যে, 'স্বাধীনতাই ব্যক্তির সর্বোচ্চ অধিকার'। রাষ্ট্র যদি বাইরে থেকে ব্যক্তির কার্যকলাপকে নিয়ন্ত্রণ করে, সাম্য নীতিকে কৃত্রিমভাবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করে, তবে স্বাধীনতার পরিবেশ বিলুপ্ত হবে। ব্যক্তিমানুষের কাছে এই ক্ষতির মূল্য অপরিসীম। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের এই ধারণা আমরা জন স্টুয়ার্ট মিল বা হারবার্ট স্পেনসারের রচনার মধ্যে পাই। মিল বলেন যে, সাম্য নীতির প্রভাবে "একজন তথাকথিত সুখী মানুষের চেয়ে অসুখী সক্রেটিস হওয়া বাঞ্ছনীয়।"

তবে অধিকাংশ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী সাম্য ও স্বাধীনতার পরস্পর বিরোধী সম্পর্ককে মেনে নিতে পারেননি। এই দুই আদর্শের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ককে কয়েকটি দিক থেকে আলোচনা করা যায়।

সাম্য ও স্বাধীনতা পরস্পরের পরিপূরক

প্রথমত, স্বাধীনতা অথবা সাম্যকে কার্যকর করার জন্য উভয়ের সহাবস্থান একান্ত আবশ্যক। অধ্যাপক ল্যাস্কি মনে করেন যে, সমাজে সাম্য না থাকলে জনগণের স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করা যায় না। স্বাধীনতার জন্য একটি নির্দিষ্ট সামাজিক পরিবেশ প্রয়োজন। সমতা ব্যতীত উক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। বৈষম্যের অবসান সমস্ত মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশের ক্ষেত্রে সমান সম্ভাবনা সৃষ্টি করে। সুতরাং সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত না হলে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। রুশোর মতে, সাম্য ব্যতীত স্বাধীনতার অস্তিত্ব কল্পনাই করা যায় না।

দ্বিতীয়ত, বার্কারের মতে, সমতা কোনো একটি বিচ্ছিন্ন নীতি নয়। সমাজের সাম্যকে কার্যকরী করতে হলে স্বাধীনতার সঙ্গে সাম্যের সহযোগিতা প্রয়োজন। স্বাধীনতা হল ব্যক্তির বিকাশের সুযোগ। কিন্তু ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ তখনই আদর্শ সমাজ গড়ে তুলতে পারবে যখন এই সুযোগের ক্ষেত্রে সমতা প্রতিষ্ঠিত হবে।

তৃতীয়ত, সাম্য ও স্বাধীনতা উভয় ধারণাই বর্তমানে আইনগত ধারণার অন্তর্ভুক্ত। স্বাধীনতা রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত এবং রাষ্ট্রীয় গঠনের দ্বারা সংরক্ষিত হয়। স্বাধীনতা সংরক্ষণের

Scanned by CamScanner

জন্য রাষ্ট্রীয় আইন সমাজের মধ্যে বিশেষ সুযোগ সুবিধার অবসান ঘটায়। তবে ধনবৈষম্যমূলক সমাজে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার জন্য রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে আইনগত স্বাধীনতার কোনো মূল্য থাকে না।

চতুর্থত, মার্কসবাদীরা স্বাধীনতা ও সাম্যের দুটি আদর্শকে অবিচ্ছেদ্য বলে মনে করেন। এঁরা স্বাধীনতাকে নেতিবাচক অর্থে না দেখে ইতিবাচক অর্থে বিচার-বিবেচনা করেন। স্বাধীনতা শব্দটিকে তাঁরা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের বিপরীত অর্থে প্রয়োগ করেন। মার্কসবাদীদের মতে, সমাজে অবাধ প্রতিযোগিতা, ব্যক্তিগত মালিকানা ইত্যাদির অবসান হলে প্রকৃত স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। মার্কসবাদীরা অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকে সমস্ত স্বাধীনতার অগ্রদূত বলে মনে করেন। সুতরাং অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত না হলে অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নয়। অধ্যাপক আপ্তেকারের মতে, সাম্য ও স্বাধীনতার পারস্পরিক সহাবস্থানের মধ্যে দিয়েই উন্নততর সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব।

তাই উপসংহারে বলা যায় স্বাধীনতা ও সাম্যের মধ্যে সমন্বয় সাধন হলে তবেই মানবজীবন সম্যকরূপে অর্থপূর্ণ হয়ে উঠবে।

এক নজরে সাম্যের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক

- সাম্যের অর্থ হল ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের জন্য উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধার সমতা।
- অধ্যাপক হ্যারল্ড ল্যাস্কি তাঁর গ্রন্থে সাম্যের তিনটি নীতি উল্লেখ করেছেন:
  — বিশেষ সুযোগ-সুবিধার অভাব
  — সকলের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা
  — ন্যূনতম মৌলিক অধিকারগুলি উপভোগের সুযোগ
- সাম্য মূলত তিনভাগে বিভক্ত: (১) স্বাভাবিক সাম্য, (২) আইনগত সাম্য — এর মধ্যে রয়েছে ব্যক্তিকেন্দ্রিক সাম্য, রাজনৈতিক সাম্য ও অর্থনৈতিক সাম্য এবং (৩) পৌর বা সামাজিক সাম্য।
- সাম্য ও স্বাধীনতা একে অপরের পরিপূরক
- মার্কসবাদীদের মতে অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা হলে তবেই রাজনৈতিক ও আইনগত সাম্য কার্যকরী হয়। শ্রেণিবিভক্ত শোষণভিত্তিক সমাজে প্রকৃত সাম্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।

গ্রন্থসূত্র:

১। সরকার, অশোককুমার, *সংসদ রাষ্ট্রবিজ্ঞান অভিধান*।
২। চক্রবর্তী, হিমাচল, *রাষ্ট্রবিজ্ঞান*।
৩। দাশ, দীপককুমার (সম্পাদিত), *রাজনীতির তত্ত্বকথা*।
৪। Heywood, Andrew, *Key Concepts in Politics.*
৫। Laski, Harold, *A Grammar of Politics.*
৬। Barker, Ernest, *Principles of Social and Political Theory.*
৭। Acharya, Ashok, 'Equality' in Rajeev Bhargava and Ashok Acharya (eds.) *Political Theory.*
৮। Sen, Amartya, *Inequality Re-examined.*

Scanned by CamScanner

পঞ্চম অধ্যায়

অধিকার, ন্যায়বিচার ও স্বাধীনতা
(Rights, Justice and Freedom)

ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের দ্বন্দ্ব রাষ্টবিজ্ঞানের চিরকালীন সমস্যা। যুগে যুগে এই দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করার চেষ্টা হলেও আজ পর্যন্ত এই সমস্যার সর্বজনগ্রাহ্য স্থায়ী সমাধান সম্ভব হয়নি; হয়তো সম্ভবও নয়। তার মূল কারণ বোধ হয় একটা— মানব সমাজের সদা পরিবর্তনশীল প্রকৃতি, যেখানে পুরাতন, জীর্ণ মূল্যবোধের পরিবর্তে আবির্ভাব হয় নতুন মূল্যবোধের, এবং ব্যক্তি সম্পর্কটিকে দেখা হয় নতুন সময়ের আলোকে। একদিকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রবল স্পৃহা ও অন্যদিকে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের বাস্তব তাগিদ— উভয়ের টানাপোড়েনের প্রেক্ষিতেই অধিকারের প্রশ্নটি পর্যালোচনা করতে হবে। সাধারণভাবে বলতে গেলে অধিকার হল মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপযোগী সেইসব সুযোগসুবিধা যেগুলি রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত ও সংরক্ষিত হয়। অধ্যাপক হ্যারল্ড ল্যাস্কি (Harold Laski) লিখেছিলেন, কী ধরনের অধিকার নাগরিকদের প্রদান করা হয়— তাই নির্ধারণ করে দেয় একটি রাষ্ট্রের চরিত্র (Every state is known by the rights that it maintains. — *A Grammar of Politics*)।

অধিকার প্রশ্নে উদারনৈতিক বা বুর্জোয়া ধারণা এবং সমাজতান্ত্রিক ধারণা পৃথক। উদারনৈতিক চিন্তায় রাজনৈতিক ও পৌর অধিকারের উপর যতটা জোর দেওয়া হয়, সামাজিক বা অর্থনৈতিক সাম্যের অধিকারটি ততটাই উপেক্ষিত। অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে অর্থনৈতিক সাম্যের অধিকারের উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়; রাজনৈতিক অধিকারের পরিধি বেশ খানিকটা সীমিত। আবার উদারনৈতিক চিন্তাধারার মধ্যেও অধিকার প্রশ্নে মতবিরোধ আছে— বিশেষ করে ব্রিটিশ ও মার্কিন অবস্থান এ বিষয়ে আলাদা। ব্রিটিশদের ধারণা হল অধিকার তাদের এতই মজ্জাগত ও স্বাভাবিক যে তা কোনো

লিখিত সংবিধানের দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভর করে না; দেশের উদারনৈতিক ঐতিহ্য (liberal tradition) ও উত্তরাধিকারই তার সবচেয়ে বড়ো রক্ষাকবচ। অপর দিকে মার্কিনি প্রত্যয় হল লিখিত সংবিধানে সংহিতাকারে অধিকারগুলি লিপিবদ্ধ না থাকলে তা সুনিশ্চিত হবে না। বুর্জোয়া সংবিধানে অধিকারের ঘোষণা প্রসঙ্গে সমাজতান্ত্রিক লেখকদের অবস্থান আবার ভিন্ন। তাঁরা বিশ্বাস করেন বুর্জোয়া দেশগুলিতে যে অধিকারের বিল থাকে তা মূলত শ্রেণিস্বার্থকে রক্ষা করে এবং সামাজিক অসাম্যকে প্রাতিষ্ঠানিক মর্যাদা দান করে।

অধিকারের সংজ্ঞা: অধিকার বলতে বোঝায় মানুষ হিসেবে, ব্যক্তি হিসেবে, রাষ্ট্রের নাগরিক হওয়ার সুবাদে, কোনো গোষ্ঠীর সদস্য হওয়ার জন্য কোনো ব্যক্তিমানুষের কিছু ন্যায়সঙ্গত দাবি, কিছু সুযোগ-সুবিধার দাবি যা তার প্রাপ্য ব্যক্তিসত্তা নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয়। অধিকারের কিছু বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা যেতে পারে:

- অধিকার হল কিছু দাবি
- অধিকার শুধুমাত্র দাবি নয়; যুক্তিসঙ্গত ও ন্যায্য দাবি
- এই সকল দাবি রাষ্ট্র স্বীকৃত ও রাষ্ট্রীয় আইন দ্বারা স্বীকৃত হতে হবে।
- অধিকারের সঙ্গে কর্তব্যের বিশেষ সম্পর্ক আছে কারণ অধিকার, সমাজ-নিরপেক্ষ কোনো ধারণা নয়। গ্রীনের ভাষায়, "Our self is a social self"। তাই অধিকারের মধ্যেই কর্তব্যের ধারণা নিহিত।

বার্কারের মতে, অধিকার হল মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপযোগী সেইসব সুযোগসুবিধা যেগুলি রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত ও সংরক্ষিত হয়। আর স্বাধীনতা বলতে এমন এক পরিবেশকে বোঝায়, যে পরিবেশে মানুষ তার ব্যক্তিসত্তাকে বিকশিত করার সুযোগ পায়। অধ্যাপক ল্যাস্কির ভাষায়, "স্বাধীনতা বলতে আমি সেই পরিবেশের সযত্ন সংরক্ষণকে বুঝি, যেখানে মানুষ তার ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশের সুযোগ পায়।" ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপযোগী এই সুযোগসুবিধাগুলিকেই আবার অধিকার বলা হয়। সুতরাং অধিকারগুলির সমবেত উপস্থিতির মাধ্যমে স্বাধীনতা ভোগের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্ট হয়। সহজভাবে বললে, অধিকারের দ্বারাই স্বাধীনতার পরিবেশ গড়ে ওঠে। সেই কারণেই ল্যাস্কি বলেছেন, "স্বাধীনতা হল অধিকারের ফল" (Liberty is the product of rights)।

অধিকার একটি আইনগত ধারণা। রাষ্ট্র কর্তৃক প্রণীত আইনের মাধ্যমে স্বীকৃত ও সংরক্ষিত না হলে অধিকারের সৃষ্টি হয় না। অধিকারের ন্যায় স্বাধীনতাও একটি আইনগত ধারণা, কারণ রাষ্ট্র আইনের মাধ্যমে স্বাধীনতার পরিবেশ রচনা করে এবং কেবলমাত্র রাষ্ট্রের মধ্যেই স্বাধীতার উপলব্ধি সম্ভবপর হয়। উদাহরণস্বরূপ, একটি শ্রমিকের জীবনকে অর্থপূর্ণ

Scanned by CamScanner

করার জন্য অন্যান্য অধিকারের সঙ্গে অর্থনৈতিক অধিকারও দরকার, অর্থাৎ তার কর্মের অধিকার, উপযুক্ত মজুরি পাওয়ার অধিকার, বিশ্রামের অধিকার— ইত্যাদি সুনিশ্চিত করা দরকার। রাষ্ট্র তার আইনের মাধ্যমে এইসব সুযোগসুবিধা সুনিশ্চিত করলে তবে সে অভাব অনটন থেকে মুক্তির স্বাদ পায় এবং ক্রমশ সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের উপযুক্ত হয়ে ওঠে। বার্কার বলেছেন, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পরাধীন শ্রমিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাধীন হতে পারে না। সুতরাং অধিকার হল স্বাধীনতার একটি অত্যন্ত সহযোগী উপাদান।

অধিকারের প্রকারভেদ

মানুষ হিসাবে আমরা যেসব অধিকার ভোগ করি সেগুলিকে মূলত দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে— (১) নৈতিক অধিকার এবং (২) আইনগত অধিকার। যেসব অধিকার সামাজিক নীতিবোধ ও বিবেকের ওপর প্রতিষ্ঠিত সেগুলি হল নৈতিক অধিকার। এই ধরনের অধিকারকে রাষ্ট্র সাধারণত স্বীকৃতি দেয় না। আর যেসব অধিকার রাষ্ট্রীয় আইনের মাধ্যমে স্বীকৃত ও সংরক্ষিত, সেগুলি হল আইনগত অধিকার। আইনগত অধিকারগুলি আবার চার ভাগে বিভক্ত, যথা— (১) পৌর বা নাগরিক অধিকার, (২) রাজনৈতিক অধিকার, (৩) অর্থনৈতিক অধিকার এবং (৪) সামাজিক অধিকার।

(১) পৌর অধিকার: সুষ্ঠুভাবে জীবনযাপনের জন্য অপরিহার্য অধিকারগুলি হল পৌর বা সামাজিক অধিকার, যেমন— (ক) জীবনের অধিকার, (খ) স্বাধীনতার অধিকার, (গ) চিন্তা ও মতপ্রকাশের অধিকার, (ঘ) সম্পত্তির অধিকার, (ঙ) ধর্মাচরণের অধিকার, (চ) পরিবার গঠনের অধিকার ইত্যাদি।

(২) রাজনৈতিক অধিকার: রাজনৈতিক অধিকার বলতে রাষ্ট্রীয় কার্যে নাগরিকদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণের সুযোগসুবিধাকে বোঝায়। রাজনৈতিক অধিকারগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— (ক) ভোটদানের অধিকার, (খ) নির্বাচিত হওয়ার অধিকার, (গ) সরকারি চাকরি পাওয়ার অধিকার, (ঘ) আবেদন করার অধিকার, (ঙ) সরকারকে সমালোচনা করার অধিকার ইত্যাদি।

(৩) অর্থনৈতিক অধিকার: অর্থনৈতিক অধিকার বলতে ক্ষুধা, বেকারত্ব ও অভাব-অনটন থেকে মুক্তির অধিকারকে বোঝায়। অর্থনৈতিক অধিকারগুলি হল: (ক) কর্মের অধিকার, (খ) উপযুক্ত পারিশ্রমিক পাওয়ার অধিকার, (গ) অবকাশের অধিকার, (ঘ) বৃদ্ধ অথবা অক্ষম অবস্থায় অর্থনৈতিক সুরক্ষা পাওয়ার অধিকার, (ঙ) শ্রমিক সংঘ গঠনের অধিকার ইত্যাদি।

(৪) সামাজিক অধিকার: সামাজিক অধিকার হল সেইসব সুযোগসুবিধা যেগুলি মানুষের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্য অপরিহার্য, যথা— (ক) শিক্ষার অধিকার, (খ) ধর্মের অধিকার, (গ) স্বাস্থ্যের অধিকার, (ঘ) সুস্থ সামাজিক পরিবেশের অধিকার ইত্যাদি।

সদর্থক কার্য (Affirmative Action)

যারা দীর্ঘকাল ধরে টিকে থাকা কিছু প্রচলিত সামাজিক বৈষম্যের শিকার তাদের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র সুযোগসুবিধার সমতা আত্মবিকাশের জন্য যথেষ্ট নয়। রাষ্ট্রকে এই বৈষম্যের শিকার ব্যক্তি বা গোষ্ঠীদের জন্য অতিরিক্ত কিছু করতে হয়। রাষ্ট্রের এই অতিরিক্ত কাজকেই 'সদর্থক কার্য' (Affirmative Action) আখ্যা দেওয়া হয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশেই এই সদর্থক কার্যের মাধ্যমে রাষ্ট্র সাম্যের আদর্শকে রূপায়িত করার চেষ্টা করে। যেমন রাষ্ট্র পশ্চাৎপদ ও অনুন্নত গোষ্ঠীর মানুষদের জন্য অবৈতনিক শিক্ষা, বিশেষ ধরনের প্রশিক্ষণ, অবৈতনিক আবাসন, বিনামূল্যে পুস্তক বিতরণ, মেধাবৃত্তি প্রভৃতির ব্যবস্থা করে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অন্যদের সমকক্ষ করে তোলার চেষ্টা করে। ভারতের ক্ষেত্রে এগুলি ছাড়াও রাষ্ট্র তপশিলি জাতি, উপজাতি ও অনুন্নত শ্রেণির মানুষদের জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ও সরকারি চাকুরির ক্ষেত্রে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। সাধারণত এই বিশেষ সুবিধাগুলি চিরস্থায়ী হয় না, নির্দিষ্ট সময়কালের জন্য হয়। এই ব্যবস্থার পশ্চাতে এই ভাবধারা কাজ করে যে নির্দিষ্ট সময়ের পর সমাজে বিভিন্ন প্রচলিত বৈষম্যের শিকার যারা তারা এই বিশেষ সুযোগসুবিধা কাজে লাগিয়ে প্রতিযোগিতায় অন্যান্য মানুষদের সমকক্ষ হয়ে উঠবে।

আধুনিক কালে একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা হল গোষ্ঠীগত অধিকার বা Community Right। উইল কিমলিকা প্রমুখ কৌমবাদী লেখকগণ দেখিয়েছেন যে মূলস্রোতের (main stream) প্রবক্তাদের মধ্যে লক্ষ করা গেছে স্বতন্ত্র সংখ্যালঘু সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীগুলিকে (LGBTQ) আত্তীকরণের এক প্রবণতা। তাই গোষ্ঠীগত অধিকারের প্রশ্নটি আজ বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। সম্প্রতি ভারতের কোর্ট সমকামীদের অধিকার স্বীকার করে নিয়েছে।

রাষ্ট্রের বিরোধিতা করার অধিকার (Right of Resistance)

রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নাগরিকদের কোনো অধিকার থাকা উচিত কিনা— এটি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি জটিল ও বিতর্কিত প্রশ্ন। অদ্যাবধি এবিষয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে কোনো ঐকমত্য গড়ে ওঠেনি। প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক প্লেটো ও অ্যারিস্টটল, ভাববাদী দার্শনিক হেগেল প্রমুখ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধাচরণের অধিকার স্বীকার করেননি। অন্যদিকে জন লক-এর মতে রাষ্ট্র যদি নাগরিকদের জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তির স্বাভাবিক অধিকার (Natural Rights) রক্ষা

Scanned by CamScanner

করতে ব্যর্থ হয় তাহলে জনগণ শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে পারেন। লক এক্ষেত্রে 'Appeal to Heaven' কথাটি ব্যবহার করেছেন। উদারনৈতিক আদর্শবাদী দার্শনিক গ্রীনের মতে রাষ্ট্র যদি গণমঙ্গলের নৈতিক আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয় তাহলে রাষ্ট্রের বিরোধিতা করা শুধু অধিকার নয়, নাগরিকদের নৈতিক কর্তব্য (moral duty)। অধ্যাপক ল্যাস্কি, মহাত্মা গান্ধী মোটামুটি একই কথা বলেছেন। বার্কারের মতে, "The mischiefs of obedience have to be weighed against the mischief of disobedience"। অর্থাৎ অন্যায্য আইনের প্রতিরোধ করা বা তা মেনে নেওয়া পরিস্থিতি বিচার করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। মার্কস শ্রেণিশাসনের যন্ত্র পুঁজিবাদী রাষ্ট্রকে বিরোধিতার কথা বলেছেন।

অধিকার সম্পর্কে মূল বক্তব্যসমূহ

- অধিকার বলতে বোঝায় ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপযোগী সেইসব সুযোগ-সুবিধা যা রাষ্ট্রের দ্বারা স্বীকৃত ও সংরক্ষিত।
- ব্যাপক অর্থে অধিকারগুলিকে নানাভাবে ভাগ করা যায়। যথা— পৌর ও রাজনৈতিক অধিকার, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার।
- অধিকার বিষয়ে অনেক তত্ত্ব আছে। যথা— স্বাভাবিক অধিকারের তত্ত্ব, আইনি তত্ত্ব, ভাববাদী তত্ত্ব, মার্কসীয় তত্ত্ব, কৌমবাদী তত্ত্ব, বহুসাংস্কৃতিক তত্ত্ব, হিতবাদী তত্ত্ব, নয়া-উদারনীতিবাদী তত্ত্ব, ন্যায়বিচারভিত্তিক তত্ত্ব, নারীবাদী অবস্থান প্রভৃতি।
- মানব অধিকার প্রতিষ্ঠা ও রক্ষার ইতিহাস মানুষের দীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাস।
- মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকারের মধ্যে পার্থক্য আছে। সব মৌলিক অধিকার মানবাধিকার। কিন্তু সব মানবাধিকার মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত হয় না।
- অধিকার ও কর্তব্য অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

অধিকারের বিভিন্ন তত্ত্ব (Theories of Rights)

ল্যাস্কি, বার্কার, ম্যাকাইভার, রলস্, কিমলিকা ও বিভিন্ন আধুনিক লেখকদের অনুসরণ করে আমরা অধিকারের কতকগুলি তত্ত্ব চিহ্নিত করতে পারি:

- স্বাভাবিক অধিকারের তত্ত্ব (Theory of Natural Rights)
- অধিকারের আইনি তত্ত্ব (Legal Theory of Rights)
- অধিকারের ভাববাদী তত্ত্ব (Idealist Theory of Rights)
- অধিকারের মার্কসীয় তত্ত্ব (Marxist Theory of Rights)

- অধিকার সম্পর্কে হিতবাদী তত্ত্ব (Utilitarian Theory of Rights)
- অধিকার সম্পর্কে ইচ্ছাস্বাতন্ত্র্যবাদ (Libertarian Theory of Rights)
- কৌমবাদী ধারণা (Communitarian Theory of Rights)
- অধিকার প্রসঙ্গে রলস্ (Rawls on Rights)
- বহুসংস্কৃতিবাদের দৃষ্টিভঙ্গি (Multicultural Perspective)
- নারীবাদী চ্যালেঞ্জ (The Feminist Challenge)

প্রত্যেকটি তত্ত্ব নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল:

• স্বাভাবিক অধিকারের তত্ত্ব (Theory of Natural Rights):

স্বাভাবিক অধিকারের তত্ত্ব অধিকার সম্পর্কে প্রাচীনতম তত্ত্ব। প্রাচীন গ্রিসের স্টোয়িক (Stoic) দার্শনিকদের এবং তারপর রোমান আইন বিশারদদের রচনায় স্বাভাবিক আইন ও স্বাভাবিক চুক্তি মতবাদের অন্যতম প্রধান প্রবক্তা ইংরেজ দার্শনিক জন লক তিনটি স্বাভাবিক অধিকারের কথা বলেছিলেন— এগুলি হল জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তির অধিকার (Life, Liberty and Property)।

• অধিকারের ভাববাদী তত্ত্ব (Idealist Theory of Rights):

অধিকারের ভাববাদী তত্ত্ব বলতে মূলত রুশো ও হেগেলের তত্ত্বকে বোঝায়। গ্রীনের তত্ত্বে আবার ভাববাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সংমিশ্রণ লক্ষ করা যায়। এঁদের মতে ব্যক্তির সমাজ ও রাষ্ট্র-নিরপেক্ষ কোনো অধিকার থাকতে পারে না। রাষ্ট্রই ব্যক্তির প্রকৃত স্বাধীনতা বা প্রকৃত অধিকারের আধার। রুশোর মতে ব্যক্তির ইচ্ছা সাধারণ ইচ্ছার (General will) অধীন। আর হেগেল বলেছেন, "Nothing short of the state is the actualization of freedom"। গ্রীন ভাববাদী হলেও প্রয়োজনে রাষ্ট্রের বিরোধিতা করাকে 'moral duty' বলে স্বীকার করে নিয়েছেন।

• অধিকারের হিতবাদী তত্ত্ব (Utilitarian Theory of Rights):

বেস্থাম উপযোগিতাবাদের উপর ভিত্তি করে রাষ্ট্রের কার্যাবলি, রাজনৈতিক বাধ্যতা, অধিকার প্রভৃতি বিষয়ের বিচার করেছেন। তাঁর মতে, ব্যক্তিজীবনে এমন অনেক ক্ষেত্র আছে বা ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন; রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ সেখানে অনভিপ্রেত। তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের সর্বাধিক মঙ্গল (greatest good of the greatest number)-এর জন্য রাষ্ট্রের আইনব্যবস্থা ও সাংগঠনিক কাঠামোকে যথাযথভাবে গড়ে তোলা প্রয়োজন। রাজীব ভার্গব ও অশোক আচার্য সম্পাদিত Political Theory গ্রন্থে অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে পাপিয়া সেনগুপ্ত তালুকদার বলেছেন হিতবাদী তত্ত্বের ভিত্তি হল 'Benthamite Principle of Utility'।

Scanned by CamScanner

• **অধিকারের আইনি তত্ত্ব (Legal Theory of Rights):**

এই তত্ত্বের মূল বক্তব্য হল, অধিকার একমাত্র আইনের দ্বারা সৃষ্ট হতে পারে। অস্টিন আইনগত অধিকার ও প্রথাগত অধিকারের মধ্যে পার্থক্য করেছিলেন। কারণ এই তত্ত্বে কেবল রাষ্ট্রীয় আইনের দ্বারা স্বীকৃত অধিকারকেই মান্যতা দেওয়া হয়েছে।

• **অধিকারের মার্কসীয় তত্ত্ব (Marxist Theory of Rights):**

ঐতিহাসিক বস্তুবাদের ওপর ভিত্তি করে অধিকার সম্পর্কিত মার্কসীয় তত্ত্ব গড়ে উঠেছে। এই তত্ত্ব অনুযায়ী অধিকার যেহেতু সমাজব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল সেহেতু সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অধিকারের ধারণারও পরিবর্তন ঘটে। সুতরাং কোনো অধিকারই দেশ-কাল নিরপেক্ষ নয়। ঐতিহাসিক বস্তুবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে মার্কসবাদীরা বলেন যে শ্রেণিবিভক্ত সমাজব্যবস্থায় অধিকার হল শাসক ও শোষক শ্রেণির দাবির প্রতিফলন। মার্কসবাদ অনুসারে শ্রেণিবিভক্ত সমাজে আইন কখনোই আপামর জনসাধারণের অধিকার রক্ষা করে না; রক্ষা করে সমাজের প্রভুত্বকারী শ্রেণির অধিকার। মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে অর্থনৈতিক অধিকার ছাড়া সব অধিকারই মূল্যহীন। শোষণমূলক পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা ধ্বংস হলে তবেই শ্রেণিহীন, শোষণহীন সাম্যবাদী ব্যবস্থায় শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। শ্রেণিসংগ্রাম হল শোষিত মানুষের অধিকার আদায়ের অধিকার।

• **অধিকার প্রসঙ্গে রলস্ (Rawls on Rights):**

'Justice as Fairness' বা সমদর্শিতার ভিত্তিতে ন্যায়বিচারের পর্যালোচনা করা— মূলত এই ধারণার জন্যই জন রলস্ আধুনিক কালে রাষ্ট্রদার্শনিক রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত। রলস্ ন্যায়ের ধারণাতে দুটি নীতির কথা উল্লেখ করেছেন—

প্রথমত, প্রতিটি ব্যক্তির সমানাধিকার থাকবে সবচেয়ে বিস্তৃত স্বাধীনতায় যা আবার অন্যদের এই ধরনের স্বাধীনতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।

দ্বিতীয়ত, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যে তা যেন (ক) সকলকে বিশেষত সমাজের সবচেয়ে মন্দ অবস্থায় অবস্থিত ব্যক্তিদের সবচেয়ে বেশি সুবিধা এনে দেয় এবং (খ) সুযোগসুবিধার ক্ষেত্রে সমতার অবস্থা তৈরি করে সকলের জন্য উন্মুক্ত পদগুলির সঙ্গে যুক্ত হয়। রলস্ এই দুটি নীতির মধ্যে প্রথম নীতিটিকে, স্বাধীনতাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন, অর্থাৎ কোনো অবস্থাতেই একজন ব্যক্তির স্বাধীনতা লঙ্ঘিত হবে না। আবার দ্বিতীয় নীতির প্রথম অংশটিকে দ্বিতীয় অংশের তুলনায় অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ বৈষম্য এমনভাবে হবে যাতে সর্বাপেক্ষা কম সুবিধাপ্রাপ্ত সুযোগপ্রাপ্ত (worse off) মানুষদেরও সুবিধা সুনিশ্চিত হয়। পাপিয়া সেনগুপ্ত তালুকদার মন্তব্য করেছেন, "John Rawls, *A Theory of Justice* (1971) is the most influential contemporary work on rights." অর্থাৎ অধিকারের ওপরে এটি বর্তমান সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী গ্রন্থ।

• **অধিকার প্রসঙ্গে ইচ্ছাস্বাতন্ত্র্যবাদ (Libertarian Theory of Rights):**

ইচ্ছাস্বাতন্ত্র্য বা মুক্তিবাদের (Libertarianism) আধুনিক প্রধান প্রবক্তা রবার্ট নোজিক (Robert Nozick)। রলস্-এর 'Justice as Fairness' অর্থাৎ সমদর্শিতাই হল ন্যায়— এই ধারণার সমালোচনা করে নোজিক 'Entitlement Theory of Justice' বা ন্যায়ের হকদারিত্ব তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ন্যূনতম রাষ্ট্র (minimal state)-এর পক্ষপাতী। তাঁর *Anarchy, State and Utopia* (1974) গ্রন্থে নোজিক 'Patterned and end-state conception of justice' অর্থাৎ কোনো নির্দিষ্ট বিন্যাস বা শেষ লক্ষ্য মাথায় রেখে ন্যায়সঙ্গত বণ্টন ব্যবস্থার বিরোধিতা করেছেন। তিনি মনে করেন, ধনীর উপর কর আরোপ করে দরিদ্রকে সাহায্য করা আসলে ধনীর ওপর জোর জবরদস্তি করা। নোজিক বিশ্বাস করেন, কোনো সমাজে আর্থিক বৈষম্য থাকা ন্যায়বিরুদ্ধ নয়। ব্যক্তির সম্পত্তির অধিকার তাঁর আছে অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং ন্যায়সঙ্গত বণ্টনের অছিলায় সেই অধিকারে হস্তক্ষেপকে তিনি অবাঞ্ছিত মনে করেন।

• **অধিকার সম্পর্কে কৌমবাদী দৃষ্টিভঙ্গি (Communitarian Perspectives):**

কৌমবাদের প্রবক্তাদের মধ্যে চারজন দার্শনিকের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁরা হলেন অ্যালাসটেয়ার ম্যাকিনটাইয়ার (MacIntyre), চার্লস টেলর (Taylor), মাইকেল ওয়ালজার (Walzer) এবং মাইকেল স্যানডেল (Sandel)। কৌমবাদীদের মতে ব্যক্তিমানুষকে সম্পদ বণ্টনের সময় 'একক' বা 'unit' হিসাবে ধরলে ভুল করা হবে; ব্যক্তি একটি সম্প্রদায় ও সংস্কৃতি (কোম)-এর অন্তর্গত। নিজেদের মধ্যে নানা ধরনের পার্থক্য সত্ত্বেও কৌমবাদী দার্শনিকগণ মনে করেন অধিকারের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে আছে কোম (community); ব্যক্তি বা রাষ্ট্র নয়। স্যানডেল বলেছেন 'Politics of rights'-এর পরিবর্তে 'politics of common good'-এর ওপর জোর দেওয়া বাঞ্ছনীয়। আবার মাইকেল ওয়ালজার 'complex equality'-র কথা বলেছেন— সমাজের একক্ষেত্রে অসাম্য আছে বলেই অন্য ক্ষেত্রে অসাম্য থাকবে এমন কোনো কথা নেই; তাই সাম্যের ধারণাটি জটিল। কৌমবাদীরা উদারনীতিবাদী ব্যক্তির ধারণার সমালোচনা করেন এবং বলেন যে ব্যক্তি যে সমাজে বা সম্প্রদায়ে বাস করে তা-ই প্রভাবিত করে তার জীবনধারাকে। তাই সাংস্কৃতিক বিশিষ্টতাকে অবহেলা করা অনুচিত।

• **বহুসংস্কৃতিবাদের দৃষ্টিভঙ্গি (Multicultural Perspectives):**

বহুসংস্কৃতিবাদ বা সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদের প্রবক্তাদের মতে অধিকার কখনো সমজাতীয় (uniform) হতে পারে না; বিভিন্ন গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য থাকার জন্য তাঁরা

Scanned by CamScanner

'গোষ্ঠীগত অধিকার' (group rights) বা 'সংখ্যালঘুর অধিকার' (minority rights) ইত্যাদির কথা বলেন। উইল কিমলিকা (Kymlicka), ভিখু পারেখ (Bhikhu Parekh) প্রমুখ বহুসংস্কৃতিবাদের সমর্থকগণ সংখ্যালঘু গোষ্ঠীগুলির সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা সমর্থন করেন। তাঁরা বলেন, "Communities should be given special rights to preserve their cultures." অর্থাৎ সম্প্রদায়গুলিকে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি টিকিয়ে রাখার জন্য বিশেষ অধিকার দিতে হবে।

• অধিকার প্রসঙ্গে নারীবাদী চ্যালেঞ্জ (The Feminist Challenge):

অধিকার সম্পর্কে নারীবাদী দৃষ্টিকোণটি তুলে ধরেছেন সুসান মোল্লার ওকিন (Susan Moller Okin), আইরিস ম্যারিয়ন ইয়ং (Iris Marion Young), শুলামিথ ফায়ারস্টোন (Shulamith Firestone), শীলা রাউবোথাম (Shila Rowbotham) প্রমুখ লেখিকারা। এঁরা পুরুষশাসিত সমাজে লিঙ্গগত বৈষম্য, এই বৈষম্যজনিত শোষণ এবং এই শোষণের অবসান চান। তবে নারীবাদ কোনো একমাত্রিক ধারণা নয়। কিন্তু সকলেই নারী-পুরুষের সমানাধিকার দাবি করেন। মেরি উলস্টোনক্রাফটকে নারীবাদের প্রথম প্রবক্তা বলা হয়। তাঁর সাড়া জাগানো গ্রন্থটির নামই ছিল *A Vindication of the Rights of Women* (1792)। সিমোন দ্য বোভোয়ার *The Second Sex* (1949), বেটি ফ্রাইডেনের *The Feminist Mystique* (1963), কেট মিলেটের *Sexual Politics* (1970) এবং জার্মেইন গ্রীয়রের *The Female Eunuch* (1970) নারীবাদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীরা যে সর্বত্রই বৈষম্যের শিকার সেকথাই নারীবাদী তাত্ত্বিকগণ তুলে ধরেছেন। তাঁদের মতে সুযোগসুবিধা ও অধিকারের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের ভেদাভেদ থাকা বাঞ্ছনীয় নয়।

মানবাধিকারের ধারণা (Concept of Human Rights)

সাম্প্রতিককালে মানবাধিকারের ধারণা বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। প্রত্যেক মানুষ, মানুষ হিসেবে যেসব অধিকার দাবি করতে পারে তাদেরই মানবাধিকার বলে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মার্কিন রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট মানুষের চার রকমের অধিকার (Four Freedoms)-এর কথা ঘোষণা করেন— (১) বাক্ ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, (২) প্রত্যেকের নিজমত ও পদ্ধতি অনুযায়ী উপাসনার স্বাধীনতা, (৩) অভাব থেকে মুক্তি এবং (৪) ভয় থেকে মুক্তি। রাষ্ট্রসংঘের সনদে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা ও রক্ষার জন্য কতকগুলি নীতি গৃহীত হয়েছে। রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভা ১৯৪৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর Universal Declaration of Human Rights বা মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র গ্রহণ করে। ১০ই ডিসেম্বর দিনটি তাই বিশ্বজুড়ে 'মানবাধিকার দিবস' (Human Rights Day) রূপে উদযাপিত হয়।

মানবাধিকারের বিশ্বজনীন ঘোষণাপত্রে ৩নং থেকে ২১নং ধারায় পৌর ও রাজনৈতিক অধিকার এবং ২২নং ধারা থেকে ২৭নং ধারায় অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারসমূহ স্বীকৃত হয়েছে। অনেক প্রশংসনীয় উদ্যোগ নিলেও রাষ্ট্রসংঘ যথেষ্ট কর্তৃত্বের সঙ্গে মানবাধিকার সংরক্ষণের দায়িত্ব পালন করতে পারেনি। বিশ্বে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেই চলেছে। 'Ethnic Cleansing', 'Custody Death', 'Encounter Killing' প্রভৃতি ঘটনা নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। তবে ধীরে ধীরে বিশ্ববিবেক জাগ্রত হচ্ছে—এটাই আশার কথা। ভারতেও জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ও রাজ্য মানবাধিকার কমিশন গঠিত হয়েছে।

অধিকার ও কর্তৃত্বের মধ্যে সম্পর্ক (Relationship between Rights and Duties)

অধ্যাপক হবহাউস বলেছেন, "ধাক্কা না খেয়ে পথ চলার অধিকার যদি আমার থাকে, তাহলে তোমার কর্তব্য হল আমাকে প্রয়োজনমতো পথ ছেড়ে দেওয়া।" অর্থাৎ অধিকার ও কর্তব্য অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। একটিকে বাদ দিয়ে অপরটির অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। উপসংহারে বলা যায়, অধিকার ও কর্তব্য একই আদর্শের দুটি দিক। অধ্যাপক বার্কার বলেছেন, "Rights without duties are like men without shadows"। অধিকারের মধ্যেই কর্তব্যের ধারণা নিহিত থাকে।

সাম্প্রতিক বিতর্ক

সাম্প্রতিককালে ভারতে অধিকারের প্রশ্নটি জনমানসে বিতর্কের সৃষ্টি করছে। কোনো কোনো লেখক প্রশ্ন তুলেছেন আমাদের সংবিধানে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে সেই স্বাধীনতা আমরা কতখানি ভোগ করতে পারি— সে নিয়ে বুদ্ধিজীবী মহল প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁরা প্রশ্ন করেছেন যে সংবিধান যদি আমাদের জীবন ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা দিয়েই থাকে তাহলে আধার কার্ডের নামে নিজেদের সমস্ত ব্যক্তিগত তথ্য কেন অন্যের হাতে তুলে দিতে হবে?

সামাজিক কল্যাণমূলক বিভিন্ন প্রকল্প, পেনশন, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট-এ আধার কার্ড বাধ্যতামূলক করে এবার ব্যক্তিগত পরিসরেও দখল বসাতে চাইছে রাষ্ট্র ও অন্যান্য কর্পোরেট সংস্থা। অন্যদিকে নাগরিকদের গোপনীয়তা (privacy) রক্ষায় এক যুগান্তকারী রায় দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। সুপ্রিম কোর্টের নয় সদস্যের এক সাংবিধানিক বেঞ্চ গোপনীয়তার অধিকারকে মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি দিয়েছে। কোর্ট জানিয়েছে

Scanned by CamScanner

গোপনীয়তার অধিকার আসলে সংবিধানের ২১নং ধারার অন্তর্গত জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সংবিধানে গোপনীয়তার অধিকারের কোনো স্থান নেই বলে ১৯৫৮ সালে এম.পি. শর্মা মামলায় সুপ্রিম কোর্ট যে রায় দিয়েছিল এবার সে রায় খারিজ করে দিয়েছে প্রধান বিচারপতি জে.এস. খেহরের নেতৃত্বাধীন সাংবিধানিক বেঞ্চ। আবার সুপ্রিম কোর্টের পাঁচ সদস্যের এক সাংবিধানিক বেঞ্চ তাৎক্ষণিক তিন তালাককে নিষিদ্ধ করে বোঝাতে চেয়েছেন যে পার্সোনাল ল-এর থেকে মৌলিক অধিকারের দাবি অনেক বেশি। এইসব রায়ের ফলে অবশ্যম্ভাবীভাবে ভারতীয় রাজনীতিতে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে।

আধুনিক বিশ্বে যে সমস্ত রাজনৈতিক ধারণা মানুষকে আন্দোলিত করে তার মধ্যে অধিকারের ধারণা অত্যন্ত তাৎপর্যবহ। গণতান্ত্রিক চিন্তার প্রসার অধিকারের ধারণাকে প্রসারিত করেছে। O.P. Gauba তিন প্রজন্মের অধিকারের কথা (Three Generation of Rights) বলেছেন। সংখ্যালঘু মানুষদের সাংস্কৃতিক অধিকার, দূষণমুক্ত পরিবেশের অধিকার ইত্যাদি নব সংযোজন।

ন্যায়বিচার (Justice)

ডি.ডি. র‍্যাফেল (D.D. Raphael) তাঁর *Problems of Political Philosophy* গ্রন্থে বলেছেন: "Justice is a complex concept." সত্যিই 'ন্যায়' একটি জটিল ধারণা। শুধু জটিলই নয় এটি একটি পরিবর্তনশীল ধারণা। যুগে যুগে বিভিন্ন রাষ্ট্রদার্শনিকগণ দেশ-কাল-সমাজের প্রেক্ষাপটে ন্যায়ের ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন। এই আলোচনা শুরু হয় প্রাচীন গ্রিসে। ন্যায় কাকে বলে? (What is justice?)— এই প্রশ্নটিকে আবর্তন করেই প্লেটোর *Republic* গ্রন্থ রচিত হয়েছে।

এই প্রবন্ধে আমরা জন রলস্-এর ন্যায়তত্ত্ব সম্পর্কে বিশেষ আলোচনাসহ ন্যায়তত্ত্বটি পর্যালোচনা করার চেষ্টা করব। অধ্যাপক অশোককুমার সরকার 'সংসদ রাষ্ট্রবিজ্ঞান অভিধানে' ন্যায়বিচার প্রশ্নটি সুন্দরভাবে আলোচনা করেছেন। তাঁকে অনুসরণ করে আমরা প্রথমে ন্যায়নীতিকে সংজ্ঞায়িত করার সমস্যাগুলি চিহ্নিত করব এবং পরবর্তী পর্যায়ে বিশিষ্ট দার্শনিকদের ন্যায়বিচার সংক্রান্ত আলোচনার একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা দেবার চেষ্টা করব। অধ্যাপক সরকারের মতে, একটি সমাজ ন্যায়পরায়ণ (just) কিনা তা বিচার করার মাপকাঠি হল সেই সমাজে আয় ও সম্পদ, অধিকার ও কর্তব্য, ক্ষমতা ও সুযোগসুবিধা, পদ ও সম্মান কীভাবে বন্টন করা হয়। একটি ন্যায়নিষ্ঠ সমাজে এই বিষয়গুলি যথার্থভাবে বন্টিত হয়। মার্কিন দার্শনিক মাইকেল স্যানডেল্ (Michael Sandel) তাঁর Justice (2009) গ্রন্থে ন্যায়বিচার সম্পর্কে তিনটি পৃথক দৃষ্টিভঙ্গি উল্লেখ করেছেন:

- প্রথম দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিনিধিদের উপযোগবাদী বা হিতবাদী (utilitarian) বলা হয়। সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের সর্বাধিক কল্যাণ এর লক্ষ্য। Welfare বা কল্যাণ এর মূল কথা।
- দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে ন্যায়বিচারের সঙ্গে স্বাধীনতাকে যুক্ত করা হয়। উদারনীতিবাদী, নয়াউদারনীতিবাদী, মুক্তিবাদী (libertarians), রলস্, অমর্ত্য সেন প্রমুখের তত্ত্বকে এই শ্রেণিভুক্ত করা যায়। এই তত্ত্বের মূল কথা হল স্বাধীনতা বা Freedom।
- তৃতীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে সুনীতি বা virtue-র ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটল এর প্রাচীনতম প্রবক্তা।

কেউ কেউ মনে করেন আমরা আমাদের অনুভূতি বা আমাদের স্বাভাবিক ন্যায়-অন্যায় বোধ থেকে ন্যায়ের ধারণা গড়ে তুলতে পারি, কিন্তু অধ্যাপক অমর্ত্য সেন তাঁর The Idea of Justice গ্রন্থে বলেছেন যে কেবলমাত্র অনুভূতি বা আমাদের অন্তর্নিহিত ন্যায়-অন্যায়বোধ ন্যায়ের ধারণার জন্য যথেষ্ট নয়। কোনো একটি বিশেষ পরিস্থিতি বা ঘটনায় আমাদের মধ্যে এই অনুভূতি তৈরি হতে পারে যে একটি অন্যায় সংঘটিত হচ্ছে। কিন্তু এই অনুভূতি অন্যায়কে চিহ্নিত করার জন্য একটি দিক-চিহ্নের কাজ করতে পারে, তার বেশি কিছু নয়। ন্যায়-অন্যায় নিয়ে কোনো স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হলে আমাদের এই অনুভূতিকে যুক্তির কষ্টিপাথরে বিচার করতে হবে। যেমন দুর্ভিক্ষের মতো একটি সামাজিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে আমরা হয়তো অনেক মানুষের অনাহার, মৃত্যু, বিপন্নতার সাক্ষী হয়ে থাকতে পারি। কিন্তু এই বিপর্যয় থেকে অনাহার ও মৃত্যুকেও আমরা অন্যায় আখ্যা দিতে পারি না শুধুমাত্র আমাদের অনুভূতি দিয়ে, সহমর্মিতা দিয়ে। যুক্তির সাহায্যে আমাদের বুঝতে হবে যে এই দুর্ভিক্ষ কোনোভাবে রোধ করা যেত কিনা, কিংবা এই দুর্ভিক্ষ মানুষের দ্বারাই সৃষ্ট কিনা। এই দুর্ভিক্ষ বা বন্যার মতো কোনো বিপর্যয়কে অন্যায় বলে আখ্যা দেওয়া যাবে যদি যুক্তির সাহায্যে প্রমাণ করা যায় যে এই ধরনের বিপর্যয়কে রোধ করার উপায় ছিল। অর্থাৎ ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কে আমাদের সিদ্ধান্ত অনুভূতি নির্ভর হবে না, যুক্তির সিঁড়ি বেয়ে আমাদের এব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে।

ন্যায়নীতি সম্পর্কে আলোচনা খুঁজে পাওয়া যাবে প্রাচীন গ্রিসের দার্শনিকদের চিন্তায়। প্রাচীন রোমের দার্শনিক সিসেরো ও সেনেকার চিন্তায় ন্যায়নীতির উল্লেখ পাওয়া যাবে। উদারনৈতিক দর্শনের মূল স্রোতে ন্যায়ের ধারণা বিভিন্ন চিন্তাবিদদের চিন্তায় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। পুঁজিবাদের বিস্তার ও শিল্পবিপ্লব ইউরোপে একদিকে সম্পদের প্রাচুর্য নিয়ে আসে, অন্যদিকে সমাজে সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে বৈষম্য প্রকট হয়ে ওঠে। আর এই প্রেক্ষাপটে বন্টনমূলক ন্যায়ের ধারণা (distributive Justice) ন্যায়নীতির ক্ষেত্রে প্রধান হয়ে ওঠে।

Scanned by CamScanner

এক্ষেত্রে ন্যায় সম্পর্কে পাশ্চাত্য রাষ্ট্রচিন্তার পরম পুরুষ প্লেটোর ন্যায় সম্পর্কে ধারণা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তাঁর *Republic* গ্রন্থে প্লেটো বলেছেন, ন্যায় বলতে প্রত্যেক ব্যক্তি কর্তৃক তার জন্য নির্দিষ্ট কার্যাবলির সম্পাদন এবং সেই নির্দিষ্ট গণ্ডি অতিক্রম করে অপরের কার্যে হস্তক্ষেপ না করাকে বোঝায়। প্লেটোর মত অনুযায়ী, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে ন্যায় হল সমন্বয় সাধনকারী ও সম্প্রীতিপূর্ণ এমন এক ধরনের বন্ধন (a harmonious bond), যা সমাজকে সুসংহত করে এবং জনগণকে এই উদ্দেশ্যে একই সূত্রে আবদ্ধ রাখে, যাতে প্রত্যেকেই তার স্বাভাবিক যোগ্যতা ও প্রশিক্ষণ অনুসারে কর্মজীবন খুঁজে পায়। ন্যায় সম্পর্কে অ্যারিস্টটলের অবস্থান ছিল ভিন্ন। তাঁর বিখ্যাত উক্তি: 'Flutes should be given only to flute players.' অর্থাৎ তিনি যোগ্যতা অনুসারে বণ্টনের পক্ষপাতী।

ন্যায়নীতি দাবি করে যে সকল ব্যক্তিকে যথার্থ ও সমান মূল্য দেওয়া উচিত। কিন্তু সকল ব্যক্তিকে সমান মূল্য দেওয়ার উপায় কী তার সহজ কোনো উত্তর নেই। কারণ সাম্যের নীতির অনেক জটিল প্রশ্ন এর সাথে জড়িত।

সমানুপাতিক ন্যায় (Proportionate Justice):

ন্যায়নীতি যেমন সাম্যের দাবি করে তেমনভাবে অবস্থাভেদ অসাম্যের নীতি অনুসরণ করার কথাও বলে। আসলে সাম্য বলতে বোঝায় একই অবস্থায় থাকা ব্যক্তিদের প্রতি একইরকম বা সমরূপ আচরণ। কিন্তু অবস্থা নিরপেক্ষভাবে সকলের প্রতি সমান আচরণ অন্য এক ধরনের অন্যায় সৃষ্টি করতে পারে। একজন মেধাবী ও অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিকে যদি অন্যান্য ব্যক্তিদের সাথে সমানভাবে দেখা হয় মর্যাদা ও আয়ের ক্ষেত্রে তাহলে তা ন্যায়ের নীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় বলে বিবেচিত হতে পারে। অথবা আপেক্ষিকভাবে বেশি ঝুঁকি ও দক্ষতার প্রয়োজন এমন একটি কাজের সাথে যুক্ত কর্মীর মজুরি যদি একজন সাধারণ অদক্ষ কর্মীর সমান হয় তাহলেও ন্যায়নীতির লঙ্ঘন হতে পারে। অর্থাৎ ন্যায়নীতির অর্থ কঠোর ও যান্ত্রিকভাবে সাম্যের নীতির অনুসরণ ও প্রয়োগ নয়।

ন্যায়নীতির ক্ষেত্রে সাম্যের নীতিকে যান্ত্রিকভাবে অনুসরণ করা ও প্রয়োগ করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায় সমাজে পশ্চৎপদ ও দুর্বল অংশের মানুষের বিশেষ প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করলে। শারীরিকভাবে অক্ষম, বৃদ্ধ, দুর্বল ও পশ্চৎপদ অংশের মানুষ সমাজ ও রাষ্ট্রের কাছ থেকে কিছু বিশেষ সুযোগসুবিধা দাবি করে। এই দুর্বল ও পশ্চৎপদ অংশের মানুষদের জীবনধারণের ন্যূনতম চাহিদা যেমন, স্বাস্থ্য, পানীয় জল, আহার, বাসস্থান প্রভৃতি পূরণ না করে যান্ত্রিকভাবে সাম্যের নীতি অনুসরণ করা ন্যায়নীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হবে না।

সাম্যের আইনি স্বীকৃতি সবসময় যথেষ্ট না হলেও তা সমস্ত ধরনের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় একটি পদক্ষেপ। কারণ

বিশ্বের বিভিন্ন সমাজে এই ধরনের বৈষম্য আইনি ব্যবস্থার দ্বারা দীর্ঘকাল রক্ষিত হয়ে এসেছে। কিন্তু একইসাথে শুধুমাত্র সাম্যের আইনি স্বীকৃতি দিয়ে সাম্যের আদর্শ বাস্তবায়িত করা যাবে না। সেই কারণে সাম্যের আদর্শ রূপায়ণের জন্য সকলকে সমানভাবে দেখা বা সকলের প্রতি সমান আচরণ করা যথেষ্ট নয়। অনেকক্ষেত্রে সমাজের দুর্বল ও পশ্চাৎপদ অংশের মানুষের প্রতি ভিন্ন আচরণ করতে হয়। বিশেষ সুযোগসুবিধার ব্যবস্থা করতে উদ্যোগী হতে হয় রাষ্ট্রকে। উদারনৈতিক তত্ত্বে সাম্যের আদর্শ প্রতিষ্ঠার অর্থ আত্মবিকাশের জন্য সকলকে সমান সুযোগসুবিধা দেওয়া। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে সামাজিক অর্থনৈতিক কিছু বাধা এই সুযোগসুবিধাগুলিকে সমস্ত মানুষের কাছে উন্মুক্ত করার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে। রাষ্ট্রকে এইসব বাধা অপসারণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হয়।

সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থাকে Protective discrimination বা সংরক্ষণমূলক বৈষম্য অথবা সদর্থক কার্য (Affirmative Action) বলা হয়।

ন্যায়নীতির মূলকথা হল একজন মানুষ হিসাবে যা প্রাপ্য প্রতিটি মানুষকে তা দেওয়া, প্রতিটি মানুষকে মানুষ হিসাবে সমান মূল্য দেওয়া, প্রতিটি মানুষকে স্বাধীনতা, সমানাধিকার প্রদান করা, তার বেঁচে থাকা ও আত্মবিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগসুবিধা যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য, বাসস্থান প্রভৃতির ব্যবস্থা করা।

অর্থাৎ ন্যায়নীতির উদ্দেশ্য হল সমাজের স্বাধীনতা, সাম্য ও প্রয়োজনীয় সুযোগসুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষা করা। এই স্বাধীনতা, সাম্য ও প্রয়োজনীয় সুযোগসুবিধার মূল্যবোধগুলি যদি কোনো আধুনিক সমাজ পরিচালনার প্রধান কিছু মূল্যবোধ হয়ে থাকে তাহলে ন্যায়নীতির ধারণা এই মূল্যবোধগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। বার্কারের মতে ন্যায়ের ধারণা হল সেই মানদণ্ড যার দ্বারা এইসব মূল্যবোধের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা হয় ও সংঘাত হলে মীমাংসার ব্যবস্থা হয়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে ন্যায় একটি জটিল ও পরিবর্তনশীল ধারণা। প্লেটো, অ্যারিস্টটল থেকে শুরু করে আধুনিক যুগে বার্কার, র‍্যাফেল, রলস্ প্রমুখ তাত্ত্বিকেরা ন্যায়ের ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন।

বণ্টনমূলক ন্যায় (Distributive Justice)

কাম্য না হলেও আধুনিক যুগের প্রায় প্রতিটি সমাজেই দেখা গেছে সম্পদের প্রাচুর্য ও দারিদ্র্যের সহাবস্থান। একদিকে কিছু মানুষের হাতে প্রচুর সম্পদ, অন্যদিকে কিছু মানুষ জীবনধারণের ন্যূনতম প্রয়োজনগুলি মেটাতে পারছে না। আর এই অবস্থাই সম্পদের পুনর্বণ্টনের প্রশ্নকে ন্যায়নীতির কেন্দ্রীয় অবস্থানে স্থাপন করে। ন্যায় দাবি করে যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আহার, বাসস্থান, পানীয় জলের মতো ন্যূনতম সুযোগগুলি থেকে সমাজের কোনো

Scanned by CamScanner

অংশের মানুষ বঞ্চিত হবে না, যাতে প্রত্যেকেই আত্মবিকাশের পথে যাত্রা শুরু করতে পারে একটি প্রারম্ভিক রেখায় দাঁড়িয়ে। কিন্তু এই পুনর্বন্টন হবে কীভাবে, কীভাবেই বা দূর হবে এ অকাম্য সামাজিক বৈষম্য, তা নির্ধারণ করা খুব সহজ নয়। বৈষম্য দূর করার প্রশ্নে রাজনৈতিক তাত্ত্বিকদের ও দার্শনিকদের মধ্যে বিরোধ আছে। একদল তাত্ত্বিকদের বলা হয় পদ্ধতিগত ন্যায়ের (procedural justice) সমর্থক, আর অন্য এক গোষ্ঠীর তাত্ত্বিকদের বলা হয় সামাজিক ন্যায়ের (social justice) সমর্থক। পদ্ধতিগত ন্যায় দাবি করে যে ন্যায়নীতি রূপায়ণের জন্য কেবলমাত্র কিছু নিয়মনীতি অনুসরণ করা জরুরি। কোনো পদ্ধতি অনুসরণ করার ফল বা পরিণতি নিয়ে চিন্তিত নন পদ্ধতিগত ন্যায়ের প্রবক্তারা। স্বাধীন, স্বাতন্ত্র্যভোগকারী ব্যক্তিরা তাদের জীবনের সিদ্ধান্তগুলি নিজেরাই নেবে এবং তাদের কাজের পরিণতির জন্য ব্যক্তিরা নিজেরাই দায়ী। সুতরাং ন্যায় ব্যক্তির আচরণের সঙ্গে যুক্ত, কোনো সমাজের বৈশিষ্ট্য নয়। অন্যদিকে সামাজিক ন্যায়ের প্রবক্তারা মনে করেন যে ন্যায় একটি সমাজের বৈশিষ্ট্য। তাই দেখতে হবে যে কিছু স্বীকৃত নীতির নিরিখে কোনো সমাজ ন্যায় বা অন্যায়কে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে কিনা। এই তত্ত্বের প্রবক্তারা সাধারণত ন্যায়নীতির রূপায়ণের জন্য রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের কথা বলেন।

রবার্ট নোজিক (Robert Nozick) পদ্ধতিগত ন্যায়ের একজন প্রবক্তা বলে বিবেচিত হতে পারেন। নোজিকের মতে সম্পত্তি অর্জন ও হস্তান্তর প্রক্রিয়ার মধ্যে ন্যায্যতা থাকলে ও প্রতারণা না হলে ন্যায়নীতির প্রতিষ্ঠা হবে। মূলকথা হল প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে যথার্থ পদ্ধতি অনুসরণ করা, স্বীকৃত নিয়মকানুন মান্য করা ও প্রতারণা বা প্রবঞ্চনা না করা। সম্পত্তি অর্জনের ক্ষেত্রে প্রতারণা না হলে নোজিক সম্পদের পুনর্বণ্টনকে সমর্থন করবেন না। নোজিক মনে করেন যে পুনর্বণ্টনে রাষ্ট্রের ভূমিকা খুবই সীমিত। নোজিক ব্যক্তিস্বাধীনতার সমর্থক ও তাকে রক্ষা করতে প্রয়াসী।

ন্যায়ের প্রকারভেদ (Types of Justice)

ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় তিন ধরনের ন্যায়ের কথা বলা হয়েছে: "Justice—social, economic and political . . ." অর্থাৎ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়।

সামাজিক ন্যায়: সামাজিক ন্যায় বলতে ব্যক্তির অধিকার ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মধ্যে ভারসাম্যের অবস্থাকে বোঝায়। অর্থাৎ সামাজিক স্বার্থ ও ব্যক্তিস্বার্থের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানই হল সামাজিক ন্যায়বিচার।

অর্থনৈতিক ন্যায়: অর্থনৈতিক ন্যায় বলতে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৈষম্যের অনুপস্থিতিকে বোঝায়। অর্থাৎ সমাজস্থ মানুষদের মধ্যে যখন অর্থনৈতিক বৈষম্য থাকে না তখন তাকে অর্থনৈতিক ন্যায় বলে।

রাজনৈতিক ন্যায়: রাজনৈতিক ন্যায় বলতে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জনগণের স্বাধীন ও স্বচ্ছ অংশগ্রহণের পরিমণ্ডলকে বোঝায়। রাজনৈতিক ন্যায় বলতে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে সকলের সমঅধিকার ও সমঅংশগ্রহণকে বোঝায়।

এছাড়াও অনেকে আইনগত ন্যায় বা legal justice-এর কথা বলেছেন।

রলস্-এর ন্যায়বিচার তত্ত্ব (Rawls' Theory of Justice)

ন্যায়বিচার তত্ত্বে মৌলিক অবদান রেখেছেন মার্কিন দার্শনিক জন রলস্ (John Rawls 1921-2002)। ১৯৭১ সালে তাঁর *A Theory of Justice* প্রকাশিত হবার পর রাজনৈতিক দর্শনের জগতে আলোড়ন পড়ে যায়। অধ্যাপক অশোককুমার মুখোপাধ্যায়ের ভাষায়, "প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর এই দর্শনজিজ্ঞাসার আধার হিসেবে 'এ থিয়োরি অব্ জাস্টিস' বইটির দু-লক্ষ কপি বিক্রি হয়ে যায় এবং কয়েক বছরের মধ্যে এই গ্রন্থটিকে কেন্দ্র করে প্রায় পাঁচ হাজার প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় আটলান্টিক মহাসাগরের দুই তীরের দেশগুলিতে।" এই প্রবন্ধটি Rawls, Norman Barry, আমার শিক্ষক অধ্যাপক অশোককুমার মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক অশোককুমার সরকার ও আমার সহপাঠী অধ্যাপক অলক দাসের বিভিন্ন লেখার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। রলস্ তাঁর ন্যায়নীতির তত্ত্বের কাঠামো নির্মাণ করার জন্য লক্, রুশো ও কান্টের সামাজিক চুক্তি মতবাদের সাহায্য নেন। রলসের মূলকথা হল 'সমদর্শিতার ভিত্তিতে ন্যায়বিচার' (Justice as Fairness)। রলস্-এর মতে সমতার নীতি থেকে বিচ্যুতিও ন্যায়সঙ্গত বিবেচিত হতে পারে, যদি তা সমাজের ন্যূনতম সুবিধাপ্রাপ্ত লোকেদের সর্বাধিক মঙ্গলসাধন করতে পারে।

রলসের মতে ন্যায়নীতি উদ্ভূত হওয়া উচিত একটি প্রকল্পিত (হাইপোথেটিকাল) চুক্তি থেকে। রলস ধরে নেন চুক্তিতে প্রবেশ করার পূর্বে প্রারম্ভিক অবস্থানে (original position) ব্যক্তিদের জ্ঞান সীমাবদ্ধ থাকে একটি অজ্ঞতার আড়াল (veil of ignornace) দ্বারা। ফলে প্রারম্ভিক অবস্থানে ব্যক্তিরা জানে না সমাজে তাদের শ্রেণি অবস্থান, তাদের মর্যাদা। তারা জানে না তারা দলিত না ব্রাহ্মণ, সামাজিক সম্পদ বণ্টনে তাদের অংশ কী, তাদের ক্ষমতা, বুদ্ধি, শক্তি প্রভৃতি সম্পর্কে ব্যক্তিরা অবহিত নন। 'অজ্ঞতার আড়াল' থেকে ন্যায়নীতি গড়ে তুলে রলস্ নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন যে ন্যায়ের নীতি যেন সংকীর্ণ ব্যক্তিস্বার্থের দ্বারা পক্ষপাতদুষ্ট না হয়। একটি প্রকল্পিত (হাইপোথেটিকাল) অবস্থায় ব্যক্তি যখন জানে না সমাজে তার অবস্থান কী হতে যাচ্ছে তখন স্বাধীন যুক্তিবাদী সত্তা হিসেবে ব্যক্তি ধরে নেবে যে সমাজে সে সবচেয়ে পশ্চাৎপদ ও প্রতিকূল অবস্থায় (worst off) থাকতেও পারে। তার যুক্তির সাহায্যে ব্যক্তি তাই সেই ন্যায়নীতির ধারণা গ্রহণ করবে যা

Scanned by CamScanner

সবচেয়ে প্রতিকূল, পশ্চাৎপদ অবস্থায় থাকা ব্যক্তিদের সুযোগসুবিধাকে যথাসম্ভব প্রসারিত করতে চাইবে। যুক্তিবাদী, বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরা তাই স্বাধীনতা, আত্মসম্মান, বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয় সুযোগসুবিধাকে সুরক্ষিত করতে চাইবেন। রলস্ এগুলিকে আখ্যা দিয়েছেন 'প্রাইমারি গুডস্' (primary goods)। রলস্ অজ্ঞতার আড়াল থেকে প্রারম্ভিক অবস্থানে গৃহীত ন্যায়ের ধারণাতে দুটি নীতির কথা উল্লেখ করেছেন—

১। প্রথমত, প্রতিটি ব্যক্তির সমানাধিকার থাকবে সবচেয়ে বিস্তৃত স্বাধীনতায় যা আবার অন্যদের এই ধরনের স্বাধীনতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।

২। সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যে তা যেন (ক) সকলকে বিশেষ ন্যূনতম সুবিধাপ্রাপ্ত মানুষদের সুবিধা এনে দেয় এবং (খ) সুযোগসুবিধার ক্ষেত্রে সমতার অবস্থা তৈরি করে সকলের জন্য উন্মুক্ত পদগুলির সাথে যুক্ত হয়।

রলস্ এই দুটি নীতির মধ্যে প্রথম নীতিটিকে, স্বাধীনতাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন, অর্থাৎ কোনো অবস্থাতেই একজন ব্যক্তির স্বাধীনতা লঙ্ঘিত হবে না। আবার দ্বিতীয় নীতির প্রথম অংশটিকে দ্বিতীয় অংশের তুলনায় অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ সাম্যের নীতির সাথে কোনো বিচ্ছেদ ঘটলেও সবচেয়ে কম সুবিধাপ্রাপ্ত অংশের ব্যক্তিদের সুযোগসুবিধাকে যতদূর সম্ভব প্রসারিত করা হবে। বৈষম্য এমনভাবে হবে যাতে সবচেয়ে কম সুযোগপ্রাপ্ত (worst off) মানুষদেরও সুবিধা সুনিশ্চিত হয়।

রলস্ তাঁর মূল ধারণাকে এইভাবে প্রকাশ করেছেন: সমাজ সব রকমের সামাজিক প্রাথমিক জিনিস (primary goods)— স্বাধীনতা এবং সুযোগ, আয় এবং সম্পদ ও আত্মমর্যাদাদানকারী বিষয়াদি— সমানভাবে বণ্টিত হওয়া উচিত, আর সেগুলির অসম বণ্টন করা যেতে পারে, যদি তার দ্বারা সমাজে সবচেয়ে অসুবিধার মধ্যে আছে এমন এক শ্রেণির মানুষের কিছু উপকার হয়।

রলস্-এর ন্যায়নীতির দ্বিতীয় নীতিটির দুটি অংশ আছে। প্রথম অংশটি 'difference principle' বা প্রভেদনীতি নামে খ্যাত, রলস্ একে 'Maximin' বিধি বলেও বর্ণনা করেছেন— এর অর্থ হল maximization of the minimum বা সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া শ্রেণির সবচেয়ে বেশি সুবিধা প্রাপ্য।

রলস্ ন্যায়নীতির ক্ষেত্রে গুরুত্ব আরোপ করেন স্বাধীনতা অর্জন ও ন্যূনতম সুযোগসুবিধা সুনিশ্চিত করার ওপর। অন্যদিকে অমর্ত্য সেন স্বাধীনতাকেন্দ্রিক ধারণার পরিবর্তে ন্যায়নীতির আলোচনায় সামর্থ্যের প্রশ্নটিকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন। ন্যায়নীতির প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যক্তিদের কাছে শুধুমাত্র কিছু প্রাথমিক বস্তু ও পরিষেবা (primary goods and services) উন্মুক্ত করা যথেষ্ট নয়। যদি এই প্রাথমিক বস্তু ও

পরিষেবাগুলিকে জীবনের ক্ষেত্রে অর্থবহ করে তুলতে হয় তাহলে ব্যক্তিদের সামর্থ্য (capability) বৃদ্ধি করতে হবে। আর এই সামর্থ্য বৃদ্ধিই শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতার পরিধি ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠাকে নির্ধারণ করবে। শারীরিক অক্ষমতা, সামাজিক সীমাবদ্ধতা প্রভৃতি বিভিন্ন কারণেই ব্যক্তিদের সামর্থ্যের ক্ষেত্রে তারতম্য থাকতে পারে। সামর্থ্যের এই তারতম্যের ফলে ব্যক্তিদের প্রাথমিক বস্তুসমূহ ও পরিষেবায় সমান প্রবেশাধিকার থাকা সত্ত্বেও তারা তাদের স্বাধীনতার বিকাশ একইরকমভাবে ঘটাতে পারবে না।

রলস্-এর ন্যায়নীতি নানাদিক থেকে সমালোচিত হয়েছে।

- রলসের ন্যায়নীতির সবচেয়ে বড়ো সমালোচনা করেছেন কৌমবাদীরা (Communitarians)। কৌমবাদী তাত্ত্বিকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ম্যাকাইনটায়ার, টেলর, ওয়ালজার এবং স্যানডেল। এঁদের নিজেদের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও এঁরা এক বিষয়ে একমত যে রলস্-এর 'ব্যক্তি' মানুষ শূন্যগর্ভ এবং রলস্ সম্পূর্ণরূপে গোষ্ঠী চেতনাকে অস্বীকার করেছেন। সোজা কথায়, কৌমবাদী দর্শনে ব্যক্তি নয়, কৌম-নির্ভর পরিচয়কে (Community based identity) অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।
- নারীবাদী চিন্তাবিদরাও রলসের ন্যায়তত্ত্বকে সমালোচনা করেছেন। তাঁদের বক্তব্য রলসের ন্যায়তত্ত্বে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীদের অসুবিধা ও বৈষম্যের প্রশ্ন, নারীদের নিজস্ব প্রয়োজন ও পরিচিতি ইত্যাদি প্রশ্নগুলি উপেক্ষিত হয়েছে।
- মার্কসবাদীদের কাছে রলসের নৈতিক দর্শনের কোনো প্রাসঙ্গিকতা নেই। ঐতিহাসিক বস্তুবাদ অনুযায়ী উদারনৈতিক সমাজে কখনোই যথার্থ ন্যায়বিচার ও সাম্য প্রতিষ্ঠা করা যায় না। সি.বি. ম্যাকফারসন মনে করেন রলসীয় ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত পুঁজিবাদী উদ্যোগকেই সমর্থন করা হয়েছে।
- দক্ষিণপন্থী উদারনৈতিক চিন্তাবিদ রবার্ট নোজিকের প্রধান অভিযোগ হল রলসীয় ন্যায়তত্ত্বে 'ব্যক্তি' অরক্ষিত রয়ে গেছে। নোজিক ন্যূনতম রাষ্ট্র বা minimal state-এর প্রবক্তা। তাই রাষ্ট্র অভিভাবকের মতো ব্যক্তিকে দেখাশুনা করবে এই নীতি নোজিকের কাছে একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়।

অধ্যাপক অশোককুমার মুখোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন, "উদারনীতির পক্ষে এবং বিপক্ষে উভয় শিবির থেকেই রলসের ন্যায়নীতি তত্ত্বের সমালোচনা করা হয়েছে।" ১৯৮০-র দশকের শেষ দিকে রলস্ তাঁর অবস্থান পরিষ্কার করে এই সকল সমালোচনার খানিকটা জবাব দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তিনি তাঁর *Political Liberalism* (1993) গ্রন্থে স্বীকার করেন যে কোনো মুক্ত সমাজে নৈতিক বিষয়ে মতপার্থক্য থাকাই স্বাভাবিক। তাই

Scanned by CamScanner

উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সকলের কাছে আইনকে ন্যায়সম্মত ও গ্রহণযোগ্য করে তোলা একটি প্রধান চ্যালেঞ্জ। রলস্ এখানে 'overlapping consensus' বা সার্বিক ঐকমত্যের কথা বলেছেন। আজকের 'identity politics'-এর যুগে রলসের এই ধারণা খুবই প্রাসঙ্গিক।

রলসীয় ন্যায়নীতির মূলকথা

'Justice as Fairness' বা সমদর্শিতার ভিত্তিতে ন্যায়বিচার— এটি জন রলসের মূল বক্তব্য। তাঁর মতে সমাজ সব রকমের সামাজিক প্রাথমিক জিনিস (primary goods)— স্বাধীনতা এবং সুযোগ, আয় এবং সম্পদ ও আত্মমর্যাদাদানকারী বিষয়াদি— সমানভাবে বণ্টিত হওয়া উচিত, আর সেগুলির অসম বণ্টন করা যেতে পারে, যদি তার দ্বারা সমাজে অসুবিধার মধ্যে আছে এমন এক শ্রেণির মানুষের কিছু উপকার হয়। গ্রন্থসূত্র: দীপককুমার দাশ সম্পাদিত *রাজনীতির তত্ত্বকথা* গ্রন্থে অধ্যাপক অশোককুমার মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ।

ন্যায় সম্পর্কে কয়েকটি সাম্প্রতিক ধারণা (Some Contemporary Notions of Justice)

• **ন্যায় সম্পর্কে মার্কসীয় ধারণা:** ন্যায় সম্পর্কে মার্কসীয় ধারণা উপরোক্ত ধারণাগুলি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। মার্কসবাদীদের মতে, ন্যায়ের ধারণাটি শ্রেণি আধিপত্যের (class domination) সঙ্গে যুক্ত। যে কোনো শ্রেণিবিভক্ত সমাজে নীতিবোধ গড়ে ওঠে সংশ্লিষ্ট সমাজের বিত্তবান তথা আধিপত্যকারী শ্রেণির অনুকূলে। স্বাভাবিকভাবেই এরূপ সমাজে বিত্তহীন মেহনতী মানুষ ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হয়। The Communist Manifesto-তে মার্কস-এঙ্গেলস্ তাই বলেছেন, "workers have nothing to lose but their chains"। মার্কসবাদীদের মতে, একমাত্র শ্রেণিহীন শোষণহীন সাম্যবাদী সমাজেই সকল মানুষের জন্য ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

• **ন্যায় সম্পর্কে অমর্ত্য সেনের অবস্থান:** অধ্যাপক সেন তাঁর Inequality Re-examined এবং The Idea of Justice গ্রন্থ দুটিতে ন্যায়ের প্রশ্নটি পর্যালোচনা করে দেখিয়েছেন যে রলস্ 'means of freedom'-এর ওপর যতটা গুরুত্ব দিয়েছেন 'extent of freedom'-এর ওপর ততটা দেননি। অমর্ত্য সেন সামর্থ্য বা capability বৃদ্ধির ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়ার পক্ষপাতী। capability বা সামর্থ্য এবং entitlement বা

স্বত্বাধিকার— দুটিই থাকলে তবে ন্যায় প্রতিষ্ঠা হতে পারে। রাজীব ভার্গব ও অশোক আচার্য সম্পাদিত *Political Theory* গ্রন্থে ন্যায় সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে অধ্যাপিকা কৃষ্ণা মেনন বলেছেন, অমর্ত্য সেনের ধারণাকে 'extension of Rawl's theory of Justice' বলা যায়।

• **ন্যায় সম্পর্কে নারীবাদী অবস্থান:** Susan Moller Okin তাঁর Justice, Gender and the Family বইতে দেখিয়েছেন রলস্ ন্যায়কে একটি 'public sphere' বা গণপরিসরের বিষয় হিসেবে দেখেছেন। পরিবারের মধ্যেও যে অন্যায় হতে পারে সে বিষয়ে তিনি নীরব। Okin বলেছেন, যে ন্যায়তত্ত্ব পারিবারিক অসাম্য বা অন্যায় নিয়ে নীরবতা পালন করে তা তত্ত্ব হিসেবে অসম্পূর্ণ ("Any theory of justice which is silent about the inequality within the family is an incomplete one.")

জন রলস্-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয়

রলস্-এর সম্পূর্ণ নাম জন বোর্ডলি রলস্। তিনি জন্মগ্রহণ করেন ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯২১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যান্ড রাজ্যের বাল্টিমোর শহরে। তিনি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর যুগান্তকারী গ্রন্থ হল *A Theory of Justice* (১৯৭১)। Andrew Heywood বলেছেন যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইংরাজিতে লেখা রাজনৈতিক দার্শনের গ্রন্থগুলির মধ্যে এটি হল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ (The most important work of political philosophy written in English since World War II)। তাঁর সমদর্শিতা বা ন্যায্যতা রূপে ন্যায়বিচার (Justice as fairness)-এর ধারণা উদারনীতিবিদ ও সামাজিক গণতান্ত্রিক লেখকদের বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। রলস্-এর অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল *Political Liberalism* (১৯৯৩) এবং *The Laws of People* (১৯৯৯)। ২০০২ সালের ২৪শে নভেম্বর তিনি দেহরক্ষা করেন। গ্রন্থসূত্র: Andrew Heywood: *Politics.*

ন্যায়বিচার শব্দটি ল্যাটিন শব্দ জাস (Jus) থেকে উদ্ভূত। অধ্যাপক বার্কার তাঁর *Principles of Social and Political Theory* গ্রন্থে ন্যায়বিচার সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করে বলেছেন যে Justice শব্দের ব্যুৎপত্তিতে Jus, Justus, Justitia শব্দগুলির উল্লেখ পাওয়া যায়। এর অর্থ হল সংযুক্ত করা বা সামঞ্জস্য বিধান করা। বার্কারের মতে ন্যায়বিচার

Scanned by CamScanner

হল রাজনৈতিক মূল্যবোধসমূহের মধ্যে সংশ্লেষ বা সমন্বয়মূলক এক ধারণা যা যাবতীয় রাজনৈতিক মূল্যবোধের এক ঐক্যবদ্ধ ও অখণ্ড রূপ ("Justice is the reconciler and thus synthesis of political values, it is their union in an adjusted and integrated whole . .. ")। তাঁর মতে স্বাধীনতার মূল্যবোধ, সাম্যের মূল্যবোধ এবং মৈত্রীর মূল্যবোধ—এই তিন মূল্যবোধের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে ন্যায়বিচার।

স্বাধীনতা (Freedom)

যে সকল আদর্শ মানবজাতিকে সবচেয়ে বেশি অনুপ্রাণিত করেছে ও সংগ্রাম করতে উদ্বুদ্ধ করেছে তাদের মধ্যে 'Freedom' বা স্বাধীনতার আদর্শটি অন্যতম। রুশো তাঁর *Social Contract* গ্রন্থে বলেছিলেন, "Man is born free but everywhere he is in chains"। এই শৃঙ্খলামোচনের ইতিহাসই হল স্বাধীনতার ইতিহাস। ১২১৫ সালের ইংল্যান্ডে মহাসনদ বা Magna Carta, ১৬৮৮ সালে গৌরবময় বিপ্লবের পর অধিকারের ঘোষণা বা Bill of Rights, ১৭৭৬ সালে আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণা (Declaration of American Independence), ১৭৮৯ সালে ফরাসি বিপ্লবের সময় সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার আহ্বান এবং বিংশ শতাব্দীতে ১৯৪৮ সালে সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা (Universal Declaration of Human Rights) স্বাধীনতার আদর্শ বিকাশে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। O.P. Gauba মন্তব্য করেছেন, "Nobody quarrels with freedom as an end, but different schools of thought differ on the means and mode of realizing freedom." অর্থাৎ উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য হিসেবে স্বাধীনতা সকলের কাছেই কাঙ্ক্ষিত এবং সে বিষয়ে কোনো মতবিরোধ নেই, কিন্তু কী পদ্ধতিতে ও কী উপায়ে স্বাধীনতার ধারণা বাস্তবায়িত করা হবে সে বিষয়ে বিভিন্ন চিন্তাধারার রাষ্ট্রদার্শনিকদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে।

'Freedom' ও 'Liberty'-র মধ্যে পার্থক্য

অনেকে 'Freedom' ও 'Liberty' শব্দদুটি সমার্থক হিসেবে দেখেন। Andrew Heywood তাঁর Key *Concepts in Politics* গ্রন্থে 'Freedom'-এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, "Freedom or Liberty (the two terms are best used interchangeably) is, in its broadest sense, the ability to think or act as one wishes"। আবার অনেকে 'Freedom' ও 'Liberty'-র মধ্যে পার্থক্য করেছেন। অধ্যাপক Butler Shaffer বলেছেন, "Liberty is what the state decides to grant a person in terms of personal freedom. Freedom is one's individual ability to do what she or he wants. A serf has very little liberty but he has freedom of thought. No one can take away our freedom to think and believe what we want"। অর্থাৎ রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত স্বাধীনতা হল 'liberty'; আর নিজের ব্যক্তিগত সামর্থ্যের দ্বারা একজন ব্যক্তি যা ভাবেন বা করেন সেটি হল 'Freedom'। অধ্যাপক Shaffer উদাহরণ দিয়ে বলেছেন একজন ভূমিদাস বা ভূদাসের কোনো 'liberty' বা স্বাধীনতা নেই, কিন্তু তার চিন্তার 'freedom' বা স্বাধীনতা কেউ কেড়ে নিতে পারে না।

Gauba বলেছেন 'Freedom'-কে দু'ভাবে দেখা যায়— (১) Freedom as the quality of human being, অর্থাৎ মানবজাতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে প্রতিটি মানুষ যেসব অধিকার ভোগ করে তাকে স্বাধীনতা বলে; (২) Freedom as the condition of human being অর্থাৎ মনুষ্যত্ব বা ব্যক্তিত্ব বিকাশের শর্ত হিসেবে স্বাধীনতা। Gauba-র মতে, "When we consider freedom as the condition of human being, we enter the realm of liberty which is usually defined as 'absence of restaint'" অর্থাৎ Freedom বলতে যখন আমরা মনুষ্যত্ব বিকাশের শর্ত বুঝি তখন আমরা 'liberty'-র রাজ্যে প্রবেশ করি কারণ 'liberty' বলতে বোঝায় নিয়ন্ত্রণের অনুপস্থিতি।

আইজায়া বার্লিন 'ইতিবাচক স্বাধীনতা' ও 'নেতিবাচক স্বাধীনতা'র মধ্যে পার্থক্য করেছেন। একই ভাবে কোনো কোনো লেখক 'Freedom to' এবং 'Freedom from'-এর মধ্যে পার্থক্য করেছেন।

স্বাধীনতা সম্পর্কে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি
(Perspectives on Freedom)

- উদারনীতিবাদীরা (Liberals) স্বাধীনতাকে চূড়ান্ত মূল্যবোধের (supreme value) মর্যাদা দেন। ধ্রুপদী উদারনীতিবাদীরা নেতিবাচক স্বাধীনতা ও আধুনিক উদারনীতিবাদীরা সদর্থক স্বাধীনতার ওপর গুরুত্ব দেন।
- রক্ষণশীল মতবাদীরা (conservatives) মুক্তবাজার অর্থনীতির পরিপ্রেক্ষিতে পছন্দের স্বাধীনতা বা Freedom of choice-এর কথা বলেন।
- সমাজতন্ত্রবাদীরা (Socialists) যৌথ উদ্যোগে সৃজনশীল শ্রমশক্তির বিকাশ ও সামাজিক কল্যাণের উপর জোর দেন।

Scanned by CamScanner

- নৈরাজ্যবাদীরা (Anarchists) ব্যক্তির সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যের কথা বলেন এবং যে কোনো ধরনের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব বা নিয়ন্ত্রণের বিরোধিতা করেন।
- ফ্যাসিবাদী (Fascists)-দের কাছে স্বাধীনতার কোনো গুরুত্ব নেই। জাতির চূড়ান্ত নেতাকে মান্য করাই হল 'স্বাধীনতা'।
- পরিবেশবাদী (Ecologist)-রা 'ক্ষুদ্র আমি'র সঙ্গে মহাবিশ্বের যোগসূত্র স্থাপন করতে চান। রাজনৈতিক স্বাধীনতা নয়; পরিবেশকে সুরক্ষিত করাই তাঁদের কাছে স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ।
- ধর্মীয় মৌলবাদীরা (Religious Fundamentalists) স্বাধীনতাকে দেখেন আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে। will of God বা ঈশ্বরের ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করাই তাঁদের কাছে স্বাধীনতার প্রকৃত দ্যোতনা।

গ্রন্থসূত্র: Andrew Heywood, *Political Ideologies.*

বহু সংস্কৃতিবাদের প্রবক্তা উইল কিমলিকা (Will Kymlicka) তাঁর *Liberalism, Community and Culture* (1989) এবং পরবর্তীকালে *Multicultural Citizenship* (1995) প্রভৃতি পুস্তকে বলেছেন, "cultural identity is the key to individual autonomy." অর্থাৎ সাংস্কৃতিক পরিচিতি বা বৈচিত্র্য হল ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য রক্ষার চাবিকাঠি।

'স্বাধীনতা' প্রসঙ্গে ভারতের নোবেল পুরস্কার জয়ী অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক অমর্ত্য সেনের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। অমর্ত্য সেন তাঁর Development As Freedom পুস্তকে বলেছেন যে "expansion of freedom is both the means and end of development." অর্থাৎ স্বাধীনতার বিস্তার উন্নয়ন বা বিকাশের উদ্দেশ্য এবং উপায়। তাঁর মতে স্বাধীনতার বিস্তারের উপায় হল 'unfreedoms'-গুলিকে দূর করা। 'unfreedom' বলতে তিনি বুঝিয়েছেন সেই সকল নিয়ন্ত্রণ বা সুযোগসুবিধার অনুপস্থিতি যা মানুষকে তার পূর্ণ সামর্থ্য ব্যবহার করতে ও পছন্দমাফিক কাজ করতে বাধা দেয়। অধ্যাপক সেনের ভাষায়, "unfreedom prevent people from making full use of their capabilities"। অধ্যাপক সেনের মতে পৃথিবীর সাধারণ মানুষের কল্যাণের আবশ্যিক শর্ত হল তাদের স্বাধীনতা সুরক্ষিত করা (Freedom is both the end and most efficient means of sustaining economic life and the key to securing the general welfare of the world's entire population)।

অধ্যাপক সমীরকুমার দাস 'Freedom' কথাটির বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে 'মুক্তি' এবং 'Liberty' কথাটির বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে 'স্বাধীনতা' কথাটি ব্যবহার করেছেন। তাঁর

ভাষায়, "মুক্তি মানেই কোনো বন্ধন, শৃঙ্খল, দাসত্ব বা অধীনতা থেকে মুক্তি।" আর বন্ধনকে অতিক্রম করার অর্থ স্বাধীনতা যেখানে মানুষের ক্ষমতায়ন হয়। অধ্যাপক দাস 'Freedom' বা মুক্তিকে নেতিবাচক ও 'liberty' বা স্বাধীনতাকে ইতিবাচক ধারণা হিসেবে দেখেছেন। ইংরাজিতে আমরা বলতে পারি একটি হল 'Freedom from' আর অপরটি হল 'Freedom to'। অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিকশনারিতে 'Freedom' বলতে বোঝানো হয়েছে, "State of being able to do what you want, without anything stopping you." অর্থাৎ অন্য কারুর দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত না হয়ে স্বেচ্ছাকৃতভাবে কিছু করার সামর্থ্য। অন্যদিকে ওই ডিকশনারিতে 'Liberty' বলতে বোঝানো হয়েছে, "The state of being free within society form oppressive restrictions imposed by authority on one's way of life, behaviour or political views"। অর্থাৎ জীবনধারা, আচার-আচরণ এবং রাজনৈতিক মতামত যখন দমনমূলক কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত তখন সমাজজীবনের সেই অবস্থাকে বলে স্বাধীনতা। তবে আলোচ্য অধ্যায়ে 'freedom'-এর প্রতিশব্দ হিসেবে স্বাধীনতা কথাটিই ব্যবহার করব আমরা। এককথায় 'liberty' ও 'freedom'-এর পার্থক্য হল অতি সূক্ষ্ম।

স্বাধীনতার প্রকারভেদ (Types of Freedom)

বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বিভিন্ন প্রকারের স্বাধীনতার কথা বলেছেন। যথা:

১। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা (Personal Freedom): ব্যক্তিগত চাহিদা পূরণ এবং আত্মবিকাশের সর্বপ্রকার সুযোগ লাভই হল ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ভিত্তি। বার্কারের মতে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার তিনটি ভিত্তি আছে। প্রথমত, দৈহিক স্বাধীনতা; দ্বিতীয়ত, চিন্তা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা; এবং তৃতীয়ত, নিজের পছন্দ ও বিশ্বাস অনুযায়ী অন্যের সাথে সম্পর্ক স্থাপন ও চুক্তি সম্পাদনের স্বাধীনতা।

২। সামাজিক স্বাধীনতা (Social Freedom): সংক্ষেপে সামাজিক স্বাধীনতা হল সামাজিক আচার-আরচণ, রীতিনীতি, ঐতিহ্য দ্বারা সংরক্ষিত স্বাধীনতা। রাষ্ট্রীয় আইনের মধ্য দিয়ে সাধারণভাবে সামাজিক স্বাধীনতা সুরক্ষিত হয়।

৩। রাজনৈতিক স্বাধীনতা (Political Freedom): বার্কারের মতে সমাজের সদস্য হিসেবে এবং আইনানুগ সংগঠনের অংশ হিসেবে প্রাপ্ত অধিকারসমূহের উপভোগকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা বলা হয়। ল্যাস্কির মতে রাজনৈতিক স্বাধীনতার অর্থ হল নাগরিকদের রাষ্ট্র পরিচালনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ। ভোটদানের অধিকার, নির্বাচিত হবার অধিকার, সরকারি কাজের সমালোচনা করার অধিকার প্রভৃতি রাজনৈতিক অধিকারের নিদর্শন।

Scanned by CamScanner

৪। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা (Economic Freedom): অর্থনৈতিক স্বাধীনতার অর্থ হল অভাব, দারিদ্র্য ও বেকারত্ব থেকে মুক্তি। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ব্যতীত রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্থহীন। বার্কার বলেছেন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নির্ভরশীল শ্রমজীবী মানুষ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কখনোই স্বাধীন হতে পারে না। মার্কসবাদীরা অর্থনৈতিক স্বাধীনতার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেন।

৫। নৈতিক স্বাধীনতা (Moral Freedom): এর অর্থ হল ব্যক্তির নৈতিক চেতনা ও বিচারবুদ্ধির স্বাধীনতা। ইংরেজ দার্শনিক গ্রীন ও বোসাঙ্কে নৈতিক স্বাধীনতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

৬। সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা (Cultural Freedom): বর্তমান যুগে বহুসংস্কৃতিবাদ (Multiculturalism)-এর প্রবক্তাগণ সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য রক্ষার স্বাধীনতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

উপসংহার:

মুক্তি বা স্বাধীনতা (Freedom)-র একাধিক ভাষ্য আছে। David Robertson সম্পাদিত *The Routledge Dictionary of Politics*-এ বলা হয়েছে, "...there are dozens of versions of freedom as a supreme political virtue"। ঐতিহাসিকভাবে স্বাধীনতার তিনটি মাত্রা পরিলক্ষিত হয়। প্রথমদিকে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অপেক্ষা জাতীয় স্বাধীনতা বা মুক্তি (national freedom)-র ওপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হত। জাতীয় মুক্তি সংগ্রামগুলির লক্ষ্যই ছিল পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্তি। দ্বিতীয়ত, Routledge Dictionary অনুযায়ী ব্যক্তির আইনগত অধিকার বা legal rights বিশেষ গুরুত্ব পায়। পৌর স্বাধীনতা যথা মতপ্রকাশের অধিকার, সংঘ গঠনের অধিকার, ধর্মীয় স্বাধীনতা ছিল স্বাধীনতার অগ্রগতির ইতিহাসে দ্বিতীয় পদক্ষেপ। তৃতীয়ত সমাজতন্ত্র অর্থনৈতিক স্বাধীনতার ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছে। সমাজতন্ত্রবাদ বিশ্বাস করে শুধুমাত্র মতপ্রকাশের অধিকার থাকাই যথেষ্ট নয়; গণমাধ্যম বা মিডিয়া যদি Corporate house দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তাহলে স্বাধীন মতপ্রকাশের অধিকার অলীক কল্পনা মাত্র। তাই অর্থনৈতিক নিরাপত্তাকে সুনিশ্চিত করতে হবে। স্বাধীনতা সম্পর্কে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায় অধিকারের প্রসঙ্গগুলি বাদ দিলে। টি.এইচ. মার্শাল-এর মতে পৌর, রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকারের তিনটি ধারা ইতিহাসের তিনটি পর্বের, তিনটি শতাব্দীর বিবর্তনের সাথে যুক্ত— পৌর অধিকার অষ্টাদশ শতাব্দীর, রাজনৈতিক অধিকার উনবিংশ শতাব্দীর এবং সামাজিক অধিকার বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত।

রুশো বলেছিলেন, "Man is born free but everywhere he is in chains"। অর্থাৎ সব মানুষই স্বাধীন ও সমঅধিকারসম্পন্ন হয়ে জন্মায়। তবে তাদের অধিকার আইনের দ্বারা সীমাবদ্ধ। ভলতেয়ার (Voltaire) অনুরূপভাবে বলেছিলেন, "Freedom consists in being independent from everything but law"।

স্বাধীনতা ও মুক্তির আদর্শ তাৎপর্যবহ এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করায় প্রকৃত স্বাধীনতা বলতে কী বোঝায় তা আমরা মার্কস ও এঙ্গেলস-এর *The German Ideology* গ্রন্থ থেকে একটি বিখ্যাত উক্তি দিয়ে শেষ করব। তাঁরা বলেছিলেন, "In communist society, where nobody has one exclusive sphere of activity but each can become accomplished in any branch he wishes, society regulates the general production and thus makes it possible for me to do one thing today and another tomorrow, to hunt in the morning, fish in the afternoon, rear cattle in the evening, criticise after dinner, just as I have a mind, without ever becoming hunter, fisherman, shepherd or critic."

ব্যক্তির দায়িত্ব বিকাশের জন্য স্বাধীনতা অপরিহার্য। কথায় বলে যে, স্বাধীনতাহীনতায় কারও পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু ব্যক্তি বা জাতির সামগ্রিক বিকাশের জন্য স্বাধীনতা অপরিহার্য হলেও বিভিন্ন সমাজে স্বাধীনতার প্রকৃতি উক্ত সমাজের আর্থ-সামাজিক কাঠামোর উপর নির্ভরশীল।

Scanned by CamScanner

গণতন্ত্র ও কর্তৃত্ববাদ
(Democracy and Authoritarianism)

আজকের দিনে প্রায় সকলে গণতন্ত্রের জয়গান করলেও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক অ্যারিস্টটলের চোখে গণতন্ত্র ছিল 'mob rule' বা জনতার শাসন। অ্যারিস্টটল কৃত সংবিধানের শ্রেণিবিভাগে গণতন্ত্রকে বিকৃত শাসনব্যবস্থা (perverted form) হিসেবে দেখানো হয়েছে; তাঁর আদর্শ শাসনব্যবস্থা ছিল নিয়মতন্ত্র বা Polity। অ্যারিস্টটলের গুরু রূপে পরিচিত পাশ্চাত্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরমপুরুষ প্লেটোও গণতন্ত্রকে ভালো চোখে দেখেননি। প্লেটোর আদর্শ শাসনব্যবস্থা ছিল দার্শনিক রাজা (Philosopher king) দ্বারা পরিচালিত একটি ন্যায়-নির্ভর 'aristocracy of intellect' (বার্কার)। এই প্রাচীন গ্রিক দার্শনিকেরা বিশ্বাস করতেন সবাই শাসক হবার যোগ্য নন। অ্যারিস্টটল তাঁর Politics গ্রন্থে বলেছিলেন, "Some are born to rule, some are born to be ruled"।

যাই হোক বর্তমান যুগ কিন্তু গণতন্ত্রের জয়যাত্রার যুগ। এমনকী একনায়কতান্ত্রিক ও কর্তৃত্ববাদী শাসকেরাও নিজের শাসনকে বৈধতা দেবার জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন ও নিজেদের গণতান্ত্রিক বলে দাবি করেন। সবাই যে নিজেকে গণতান্ত্রিক বলতে চান সেকথা লক্ষ্য করে বার্নার্ড ক্রিক (Bernard Crick) তাঁর *In Defence of Politics* বইতে লিখেছেন: "Democracy is perhaps the most promiscuous word in the world of public affairs. She is everybody's mistress and yet somehow retains her magic even when her lover sees that her favours are being, in his light, illicitly shared by many another. Indeed, even amid our pain at being denied her exclusive fidelity, we are proud of her adaptability to all sorts of circumstances, to all sorts of company"।

'Demos' এবং 'Kratos' এই দুটি গ্রিক শব্দ থেকে ইংরাজি 'Democracy' শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। গ্রিক শব্দ 'Demos'-এর অর্থ 'জনগণ আর 'Kratos'-এর অর্থ 'শাসন'

Scanned by CamScanner

বা 'কর্তৃত্ব'। প্রাচীনকালে গ্রিসের এথেন্স (Athens) নগরীতেই Democratic Government বা গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সূত্রপাত হয়।

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আব্রাহম লিঙ্কন (Abraham Lincoln) গণতান্ত্রিক সরকারের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন সাধারণত তাকেই মোটামুটি গ্রহণযোগ্যরূপে গণ্য করা হয়। লিঙ্কনের মতে গণতান্ত্রিক সরকার হচ্ছে, "জনগণের কল্যাণে জনগণের দ্বারা জনগণের শাসন" (Government of the people, by the people and for the people)।

লিঙ্কনের সংজ্ঞাটিকে বিশ্লেষণ করলে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা যায়। যথা— (১) গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার লক্ষ্য হচ্ছে জনগণের বা জনসাধারণের কল্যাণ, কতিপয় ব্যক্তির বা গোষ্ঠীর নয়; (২) গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা জনগণের দ্বারা শাসনব্যবস্থা— যেখানে জনসাধারণ, প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে, শাসনকার্যে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে, এবং (৩) গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা জনগণের শাসনব্যবস্থা হওয়ায় সেখানে জাতি, বর্ণ, ধর্ম, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই সমান মর্যাদাসম্পন্ন ও সমান সুযোগসুবিধার অধিকারী।

গণতান্ত্রিক সরকারের বা শাসনব্যবস্থার প্রকারভেদ (Different forms of Democratic Government)

'গণতান্ত্রিক সরকার' বলতে বোঝায় 'জনগণের সরকার'। জনগণ কখনো প্রত্যক্ষভাবে আবার কখনো প্রতিনিধিদের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করে। কাজেই, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রধান দুটি প্রকার আছে— (১) প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা (Direct Democracy) ও (২) পরোক্ষ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা (Indirect Democracy)। পরোক্ষ শাসনব্যবস্থা আবার বিভিন্ন প্রকার হতে পারে, যথা— (ক) উদারনৈতিক (Liberal), (খ) সমাজতান্ত্রিক (Socialistic)।

গণতান্ত্রিক সরকার বা শাসনব্যবস্থা (Direct Democracy)

'গণতন্ত্রের' সংজ্ঞা অনুসারে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রই বিশুদ্ধ গণতন্ত্র (Pure Democracy), কেননা সেখানে প্রত্যক্ষ নাগরিক সরকারি নীতিনির্ধারণে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। কিন্তু এপ্রকার বিশুদ্ধ গণতন্ত্র বিরল। জনসংখ্যা সীমিত হলে এবং জনগণের সমস্যাবলি সহজ-সরল হলে তবেই বিশুদ্ধ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা সম্ভব হতে পারে। প্রাচীন গ্রিসের ছোটো ছোটো নগররাষ্ট্রে যথা— এথেন্সে (Athens) মোটামুটিভাবে এপ্রকার গণতন্ত্র অল্পকাল প্রচলিত ছিল। এথেন্সের সকল নাগরিক (স্ত্রীলোক, দাস ও বিদেশি ভিন্ন, কেননা তারা 'নাগরিক' রূপে গণ্য ছিল না) মাঝে মাঝে নির্ধারিত কালে ও নির্ধারিত স্থানে এক

সভায়, 'নাগরিক সভায়' (Assembly of Citizens) মিলিত হয়ে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে আইন প্রণয়ন করে, আইন নিয়োগের ব্যবস্থা করে, সরকারি বিভিন্ন কাজে কর্মচারী নিযুক্ত করে, অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র সংক্রান্ত নানা সমস্যার সমাধান করে, এমনকী বিচারকার্যও সম্পাদন করত। সহজ কথায়, রাষ্ট্রের যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় বিষয় ওই 'নাগরিক সভায়' সরাসরি আলোচিত হত। এভাবে, প্রাচীন গ্রিসের নগররাষ্ট্রগুলিতে সমস্ত নাগরিক প্রত্যক্ষভাবে শাসনকার্যের সঙ্গে যুক্ত থাকায় ওই প্রকার গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রত্যক্ষ এবং ওই প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক সরকারই, সংজ্ঞা অনুসারে বিশুদ্ধ। বর্তমানকালেও সুইজারল্যান্ডের অন্তর্গত কয়েকটি ক্ষুদ্রায়তনে 'ক্যান্টনে' ও 'আধা-ক্যান্টনে' প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র প্রচলিত আছে।

পরোক্ষ বা প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র (Indirect or Representative Democracy)

তত্ত্বের দিক থেকে গণতন্ত্র 'জনগণের শাসন' হলেও বর্তমানে বিশ্বের বৃহদায়তন জনবহুল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে সকলজনের পক্ষে শাসনকার্যে সক্রিয় অংশগ্রহণ করা সম্ভব নয়। এজন্য বর্তমানের জনবহুল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের বিকল্পরূপে পরোক্ষ বা প্রতিনিধিমূলক শাসনব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। পরোক্ষ গণতন্ত্রে জনগণের সকলেই শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করে না— তাদের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই রাষ্ট্রের শাসনকার্য পরিচালনা করেন। এপ্রকার শাসনব্যবস্থায়, নির্দিষ্ট কালের জন্য, জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিরা তাঁদের কাজকর্মের জন্য জনগণের কাছে দায়ী থাকেন। জনপ্রতিনিধি যদি তাঁর মেয়াদকালে জনস্বার্থবিরোধী কাজে লিপ্ত হন তাহলে তিনি জনগণের আস্থা থেকে বঞ্চিত হন এবং মেয়াদ অন্তে জনগণের দ্বারা তাঁর পুনর্নির্বাচিত না হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। এভাবে, পরোক্ষ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় জনস্বার্থ বহুল পরিমাণে সুরক্ষিত হতে পারে। পরোক্ষ গণতান্ত্রিক সরকার আসলে জনমতের ওপর প্রতিষ্ঠিত সরকার, কেননা জনবিরোধী কাজে লিপ্ত হলে সরকারের পতন অনিবার্য পরিণতিরূপে দেখা দেয়। রাজনৈতিক দিক থেকে জনগণই হল সার্বভৌম— সকল ক্ষমতার অধিকারী। জনমতকে এভাবে চরমমূল্য দেবার ফলে প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রে স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব সুরক্ষিত হতে পারে। কাজেই বলা চলে যে, তত্ত্বগত দিক থেকে, বর্তমানে এপ্রকার গণতান্ত্রিক সরকার এক আদর্শ সরকার।

প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রের দুটি মুখ্য প্রকার (Two main types of Representative Democracy)

প্রতিনিধিমূলক বা পরোক্ষ গণতন্ত্রের দুটি মুখ্য প্রকার আছে। যথা— (ক) উদারনৈতিক গণতন্ত্র (Liberal Democracy) এবং (খ) সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র (Socialist Democracy)।

Scanned by CamScanner

(ক) উদারনৈতিক গণতন্ত্র (Liberal Democracy)

বর্তমান বিশ্বের প্রায় সব দেশেই উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রচলিত। অতি সাম্প্রতিককালে (১৯৯০ খ্রিস্টাব্দের পরবর্তী কাল থেকে) এই ব্যবস্থাই সর্বাপেক্ষা উন্নত শাসনব্যবস্থারূপে প্রায় সব দেশেই স্বীকৃত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ভারতবর্ষ, জাপান, জার্মানি, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে উদারনৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত।

তবে, সাম্প্রতিককালে উদারনৈতিক গণতন্ত্র সর্বাধিক গুরুত্ব পেলেও সহজ ও সংক্ষিপ্তভাবে এই গণতন্ত্রের সংজ্ঞা দেওয়া যায় না। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেই কেবল উদারনৈতিক গণতন্ত্রকে চিরাচরিত বা সাবেকি গণতন্ত্র থেকে পৃথক করা যায়। অবশ্য উদারনৈতিক গণতন্ত্র চিরাচরিত গণতন্ত্রেরই একটি বিশেষরূপ, কেননা এক্ষেত্রেও সাম্য, স্বাধীনতা ও অধিকারকে শাসনব্যবস্থার মূল ভিত্তিরূপে গণ্য করা হয়। উদারনৈতিক গণতন্ত্রের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

১। রাজনৈতিক সাম্য স্বীকৃত হলেও অর্থনৈতিক সাম্যকে তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয় না— বাজারনীতি প্রতিযোগিতামূলক হওয়ায় অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। এপ্রকার গণতন্ত্রে সহযোগিতা অপেক্ষা প্রতিযোগিতা বেশি গুরুত্ব পায়।

২। রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও অধিকারের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। প্রত্যেক নাগরিকের জীবনের, সম্পত্তির, শিক্ষার, বৃত্তি নির্বাচনের, ধর্মাচরণের, নির্বাচনে নির্বাচিত করার ইত্যাদি অধিকার স্বীকার করা হয়।

৩। সর্বোপরি, আদালতকে বিশেষ ক্ষমতা অর্পণ করা হয়। সরকারের আইনসভা প্রণীত কোনো আইন অথবা শাসনবিভাগের কোনো কার্যক্রম নাগরিকদের মৌল অধিকারকে আঘাত করলে দেশের সর্বোচ্চ আদালত (Supreme Court) তার বিচারবিভাগীয় সমীক্ষার ক্ষমতা প্রয়োগ করে সেই অধিকারকে সুরক্ষিত করতে পারে।

৪। বহুদলীয় শাসনব্যবস্থাকে স্বীকার করা হয়, যেখানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে, শাসনক্ষমতা অধিকারের জন্য, অবাধে এবং প্রকাশ্যে প্রতিযোগিতা থাকে।

৫। জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেক নাগরিকের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব লাভের পথ উন্মুক্ত থাকে।

৬। নির্ধারিত মেয়াদ অন্তে, সর্বজনীন ভোটের মাধ্যমে, নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। উদারনৈতিক গণতন্ত্র প্রকৃতপক্ষে জনমতের ওপর প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্র। শাসনব্যবস্থা জনমতবিরোধী হলে ভোটের মাধ্যমে জনগণ নির্বাচিত সরকারকে অপসারিত করতে পারে।

৭। সরকারি নীতির বিরোধিতা করার অথবা সমালোচনা করার অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এজন্য গণমাধ্যমগুলিকে, যথা— সংবাদপত্র, বেতার, দূরদর্শন প্রভৃতিকে সরকারের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত রাখা হয়, যাতে ওইসব মাধ্যমগুলি সরকারের দোষ-ত্রুটির সমালোচনা করতে পারে।

৮। অধ্যাপক অ্যালান বল (Alan Ball)-এর মতে স্বার্থগোষ্ঠীগুলি সরকারি সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করতে পারে। বিভিন্ন সংগঠন যথা শ্রমিক সংঘ, বণিক সংঘ, কৃষক সংগঠন প্রভৃতি সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন নয়।

৯। কোনো কোনো লেখকের মতে উদারনৈতিক গণতন্ত্রে আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগের মধ্যে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ (Separation of Power) দেখা যায়।

১০। অনেকের মতে একটি সক্রিয় পুরসমাজ বা নাগরিক সমাজ (Civil Society) উদারনৈতিক গণতন্ত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য।

Andrew Heyhood বলেছেন, "A liberal democracy is a political regime in which a 'liberal' commitment to limited government is blended with a 'democratic' belief in popular rule." অর্থাৎ উদারনৈতিক গণতন্ত্র হল এমন একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা যেখানে সীমিত সরকার ও জনগণের শাসনের মেলবন্ধন ঘটে।

Heywood একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রকৃতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে কতকগুলি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন:

- কে শাসন করছে? রাজনৈতিক অংশগ্রহণ কি একটি প্রবর বা এলিট শ্রেণির মধ্যেই সীমাবদ্ধ না জনগণ স্বাধীনভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে?
- রাজনৈতিক আনুগত্য কীভাবে আদায় করা হয়? অর্থাৎ বলপ্রয়োগ না দরকষাকষি (bargaining) কীসের মাধ্যমে আনুগত্য আদায় করা হয়?
- সরকারি ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত না বিকেন্দ্রীভূত? রাজনৈতিক ব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের ব্যবস্থা আছে কিনা?
- সরকারি ক্ষমতা কীভাবে অর্জন করা হয় ও হস্তান্তর করা হয়?
- রাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক কী?
- সমাজে সম্পদের বন্টন কী প্রক্রিয়ায় হয়?
- অর্থনৈতিক জীবন সরকার কতটা নিয়ন্ত্রণ করে?
- রাজনৈতিক ব্যবস্থাটির স্থায়িত্ব কতটা? বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ রাজনৈতিক ব্যবস্থা কীভাবে মোকাবিলা করে?

Scanned by CamScanner

Heywood-এর মতে এসকল প্রশ্নের উত্তরের মধ্যেই লুকিয়ে আছে রাজনৈতিক ব্যবস্থা তথা গণতন্ত্রের প্রকৃতি।

সমালোচনা (Criticism)

উদারনৈতিক গণতন্ত্রে 'সাম্য', 'স্বাধীনতা' ও 'অধিকারের' উল্লেখ থাকলেও কার্যত সেসব রক্ষিত হয় না। প্রথমত, এপ্রকার গণতন্ত্রে রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও অধিকার সব নাগরিকের সমান হয় না— সমাজে প্রভাব-প্রতিপত্তি ও পদমর্যাদা ভেদে তা কমবেশি হয়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশগুলিতে যেখানে উদারনৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত, দেখা যায় যে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত সেইসব দেশগুলিতে নারী-স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়নি, নারী ও পুরুষের অধিকারকে সমদৃষ্টিতে গ্রহণ করা হয়নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বর্ণ-বৈষম্য, ভারতবর্ষের জাত-পাত বৈষম্য ইত্যাদি এটাই নির্দেশ করে যে, উদারনৈতিক গণতন্ত্রে যেসব আদর্শের কথা বলা হয় তা কেবল সংবিধানের মধ্যেই লিপিবদ্ধ থাকে, তাদের বাস্তবায়িত করার তেমন কোনো প্রচেষ্টা থাকে না।

দ্বিতীয়ত, উদারনৈতিক গণতন্ত্রের রক্ষাকবচরূপে যে জনমতের, প্রচারমাধ্যমের (সংবাদপত্র, রেডিও, দূরদর্শন) উল্লেখ করা হয় আপৎকালে তাদের কোনো কার্যকর ভূমিকা থাকে না। আপৎকালে, শাসন-ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দল 'জরুরি অবস্থা' (emergency) ঘোষণা করে গণমাধ্যমকে বে-আইনিরূপে ঘোষণা করতে পারে এবং সেভাবে সরকারবিরোধী জনমত প্রকাশের পথকে রুদ্ধ করে। তেমনি সন্ত্রাস সৃষ্টি করে উৎকোচ দিয়ে সরকার গণমাধ্যমগুলিকে বশীভূত করতে পারে।

তৃতীয়ত, উদারনৈতিক গণতন্ত্রে সহযোগিতা অপেক্ষা প্রতিযোগিতা বেশি গুরুত্ব পায় বলে ধনীর ধন এবং দরিদ্রের দারিদ্র্য ক্রমশই বৃদ্ধি পায়, যার অনিবার্য পরিণতি হল বেকারত্ব, অর্থনৈতিক মন্দা এবং মুদ্রাস্ফীতি।

(খ) সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র (Socialist Democracy)

পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন, বর্তমান গণসাধারণতন্ত্রী চীন, ভিয়েতনাম প্রভৃতি সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের উদাহরণ। সমাজতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা মুখ্যত কার্ল মার্কসের এবং লেনিনের মতবাদের ওপর নির্ভরশীল। এই ব্যবস্থার মূলে হল মার্কসের তত্ত্ব এবং লেনিনের সেই তত্ত্বের প্রয়োগ।

সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের লক্ষ্য হল পুঁজিবাদী উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার দোষত্রুটিগুলিকে অপসারিত করে এক সাম্যবাদী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠা করা, যেখানে পুঁজিপতি বুর্জোয়াদের শাসন-ক্ষমতা থেকে অপসারিত করে সর্বহারা প্রোলেতেরিয়েত সেই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। উল্লেখযোগ্য যে, কার্ল মার্কস এবং তার সহযোগী অন্তরঙ্গ বন্ধু এঙ্গেলস্ যে আদর্শ রাষ্ট্রব্যবস্থার উল্লেখ করেন তা সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণি শাসিত সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র নয়, তা হল এক শ্রেণিহীন, শোষণহীন, রাষ্ট্রহীন সাম্যবাদ-সম্মত (communism) অবস্থা। পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উচ্ছেদ ঘটিয়ে এবং মার্কসের তত্ত্বকে প্রয়োগ করে লেনিন যে রাজনৈতিক শাসনব্যবস্থা পত্তন করেন তা হল সাম্যবাদী সমাজ পত্তনের পথে এক অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা— সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র ব্যবস্থা। বর্তমানে, প্রজাতান্ত্রিক চীন, কিউবা, ভিয়েতনাম, কোরিয়া প্রভৃতি দেশগুলিতে রাজনৈতিক ব্যবস্থা হল সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র।

সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

১। এই ব্যবস্থায় সমাজের শাসনব্যবস্থা একটি মাত্র দল বা শ্রেণি নির্ধারণ করে— সর্বহারা শ্রেণি বা প্রোলেতেরিয়েত শ্রেণি। কাজেই এই ব্যবস্থা একদলীয় শাসনব্যবস্থা— শ্রমিক-কৃষক শ্রেণির একনায়কত্ব ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থায় সমাজের প্রত্যেকটি ব্যক্তিকে সমাজের গঠনমূলক কাজে নিযুক্ত থাকতে হয়।

২। একাধিক শ্রেণি না থাকায় এই ব্যবস্থায় শ্রেণিদ্বন্দ্ব বা শ্রেণি শোষণ থাকে না। সমাজের সব সম্পত্তির মালিক সর্বহারা শাসিত রাষ্ট্র। ব্যক্তিগত সম্পত্তি না থাকায়, সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান ঘটায়, সম্পত্তিকে কেন্দ্র করে ভূম্যধিকারী ও ভূমিহীনের মধ্যে, বিত্তবান ও বিত্তহীনের মধ্যে, দীর্ঘদিনের যে বিবাদ তারও অবসান ঘটে।

৩। সমাজের সমগ্র সম্পত্তি রাষ্ট্রায়ত্ত হওয়ায় এই ব্যবস্থায় ব্যক্তি মাত্রেরই অর্থনৈতিক নিরাপত্তা সুরক্ষিত হয়— অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের জন্য সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের কোনো দুর্ভাবনা বা অনিশ্চয়তাবোধ থাকে না।

৪। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রে রাষ্ট্র নাগরিকদের শ্রম ও ভোগের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে। এই নিয়ন্ত্রণের ফলে কেউ যেমন বেশি বা কম শ্রম বিনিয়োগ করতে পারে না, তেমনি ভোগও বেশি বা কম করতে পারে না। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রে প্রত্যেকে তার সামর্থ্য অনুযায়ী কার্য করে এবং কর্ম অনুযায়ী পারিশ্রমিক পায় (From each according to his ability to each according to his work)।

সমালোচনা (Criticism):

সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র নানা দোষে দুষ্ট। অতি সম্প্রতি ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে এই শাসনব্যবস্থার জন্মভূমি সোভিয়েত রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের শোচনীয় বিপর্যয়ই এই ব্যবস্থার দুর্বলতার পরিচায়ক।

প্রথমত, এই ব্যবস্থা স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থায় পরিণত হবার যথেষ্টই আশঙ্কা থাকে। এখানে একটি মাত্র দল শাসন-ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার ফলে গণতন্ত্রের পরিবেশ থাকে না এবং পরিণামে দলীয় একনায়কত্ব অথবা স্বৈরাচারতন্ত্র প্রতিষ্ঠা পায়।

Scanned by CamScanner

দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্র সর্বময় কর্তৃত্ব সম্পন্ন হওয়ায় ব্যক্তিস্বাধীনতা বলে কিছুই থাকে না। এমন অবস্থায় জনগণের, সংবাদ মাধ্যমের, এমনকি আইন-আদালতেরও নিরপেক্ষতার সরকারের কোনো জনকল্যাণবিরোধী কর্ম অথবা কর্মসূচির সমালোচনা করার অধিকার থাকে না।

তৃতীয়ত, ব্যক্তিগত সম্পত্তি রাষ্ট্র কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হলে, সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা না থাকলে, শুধুমাত্র রাষ্ট্রের স্বার্থে কর্ম করার আগ্রহ মানুষের থাকে না এবং মানুষ তার সাধ্য অনুসারে কর্ম করা থেকে বিরত থাকে।

এসকল বুর্জোয়া সমালোচনার উত্তরে বলা যায় সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রে ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের কোনো বৈর সম্পর্ক নেই। বরং ব্যক্তি সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে বিবেচিত হয়। সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রে শ্রমবিমুখ মানুষের কিংবা পরশ্রমভোগীর কোনো স্থান নেই। এই সমাজে অনুসৃত নীতিটি হল "He who does not work neither shall he eat." অর্থাৎ "যে কাজ করবে না, সে খেতেও পাবে না।" হার্বার্ট আপথেকার (Herbert Apthekar) তাঁর The Nature of Democracy, Freedom and Revolution পুস্তকে বলেছেন যে পুঁজিবাদী সমাজে প্রচলিত সম্পত্তি সম্পর্ককে বজায় রাখার জন্য নেতিবাচক স্বাধীনতার তত্ত্ব প্রচার করে। কিন্তু সমাজতন্ত্রবাদীরা পুঁজিবাদকে 'কৃত্রিম ও পরোপজীবী' (artificial and parasite) প্রকৃতি বিশিষ্ট বলে মনে করে। আপথেকার বুর্জোয়া ও মার্কসবাদী তত্ত্বের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন যে বুর্জোয়া গণতন্ত্রে কেবল রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে অন্য সব ধরনের স্বাধীনতার ভিত্তি বলে মনে করা হয়। কিন্তু মার্কসীয় তত্ত্ব অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে। অধ্যাপক ল্যাস্কিও বলেছেন অর্থনৈতিক সাম্য ছাড়া রাজনৈতিক গণতন্ত্র অর্থহীন।

গণতন্ত্র সম্পর্কে ডেভিড হেল্ডের শ্রেণিবিভাগ (David Held's Classification of Democracy)

ডেভিড হেল্ড (David Held) তাঁর Models of Democracy গ্রন্থে গণতন্ত্রের ১০টি model বা প্রতিরূপ উপস্থাপিত করেছেন। এগুলি নিম্নরূপ:

Model I	ধ্রুপদী গণতন্ত্র : এথেন্স (Classical Democracy: Athens)
Model IIa	সংরক্ষণমূলক সাধারণতন্ত্রবাদ (Protective Republicanism)
Model IIb	উন্নয়নমূলক সাধারণতন্ত্রবাদ (Developmental Republicanism)
Model IIIa	সংরক্ষণমূলক গণতন্ত্র (Protective Democracy)
Model IIIb	বিকাশমূলক বা উন্নয়নমূলক গণতন্ত্র (Developmental Democracy)
Model IV	প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র ও রাজনীতির অবসান (Direct Democracy and the End of Politics)
Model V	প্রতিযোগিতামূলক এলিট বা প্রবরবাদী গণতন্ত্র (Competitive Elitist Democracy)
Model VI	বহুত্ববাদ (Pluralism)
Model VII	আইনগত গণতন্ত্র (Legal Democracy)
Model VIII	অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্র (Participatory Democracy)
Model IX	বিতর্ক বা চর্চাভিত্তিক গণতন্ত্র (Deliberative Democracy)
Model Xa	গণতান্ত্রিক স্বাতন্ত্র্য (Democratic Autonomy)
Model Xb	বিশ্বজনীন গণতন্ত্র (Cosmopolitan Democracy)

ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থের কথা মনে রেখে কতকগুলি মডেল বা প্রতিরূপ সংক্ষিপ্তাকারে; আবার কতকগুলি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হল।

Model I: প্রাচীন এথেন্সের গণতন্ত্রের ধ্রুপদী ধারণা (Classical Democracy: Athens)

হেল্ডের মতে খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকে এথেন্স গ্রিক নগররাষ্ট্র (polis)গুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উন্নত ও সমৃদ্ধিশালী কেন্দ্র রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র ছিল এর শাসনব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য যদিও নাগরিকতার ভিত্তি ছিল সীমিত। কুড়ি বছর ঊর্ধ্ব পুরুষরাই নাগরিক বলে পরিগণিত হতেন ও রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করতেন। প্রায় ৬০০০ নাগরিক নিয়ে গঠিত Assembly ছিল সার্বভৌম সংস্থা; বছরে চল্লিশ বার এর অধিবেশন বসত। এত বৃহদায়তন একটি সংস্থা সকল প্রশাসনিক কার্য নির্বাহ করতে পারত না বলে একটি ৫০০ সদস্যের পর্ষদ (Council of 500) গঠিত হত। এথেন্সের চিরায়ত গণতন্ত্রে নাগরিকদের রাজনৈতিক সাম্যের ওপর জোর দেওয়া হত। আশা করা হত যে এইরূপ ব্যবস্থায় সকল নাগরিকই পর্যায়ক্রমে শাসন করবে ও শাসিত হবে। সেইসঙ্গে আইনগত ও বিচারসংক্রান্ত কার্যে নাগরিকদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ— চিরায়ত গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যরূপে পরিলক্ষিত হয়।

Scanned by CamScanner

যৌক্তিকতার নীতিসমূহ (Principles of Justification) নাগরিকেরা রাজনৈতিক সাম্য ভোগ করবেন যাতে পালা করে তাঁরা শাসন করেন ও শাসিত হন।

মূল বৈশিষ্ট্য (Key features)

- আইনগত ও বিচারসংক্রান্ত কাজে নাগরিকদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ
- নাগরিকদের সভার হাতে সার্বভৌম ক্ষমতা
- সার্বভৌম শক্তির পরিধি সমগ্র নগররাষ্ট্রে সাধারণ বা অভিন্ন বিষয়সমূহ পরিব্যাপ্ত
- সরকারি পদে অধিষ্ঠানের ক্ষেত্রে নিয়োগে বিভিন্ন পদ্ধতি যথা প্রত্যক্ষ নির্বাচন, লটারির মাধ্যমে বা নির্দিষ্ট সময়ান্তর বদলির প্রথা
- সাধারণ নাগরিক ও জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে সুযোগসুবিধার ক্ষেত্রে বৈষম্যের অনুপস্থিতি
- যুদ্ধ সংক্রান্ত পদ ছাড়া অন্য পদ দু'বারের বেশি কেউ দখল করতে পারবেন না
- প্রত্যেক পদের একটি সীমিত সময় নির্ধারিত
- জন সেবার জন্য পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা

সাধারণ শর্তসমূহ (General Conditions)

- ক্ষুদ্র নগররাষ্ট্র যা কৃষিজমির দ্বারা বেষ্টিত
- দাস ব্যবস্থা যা 'স্বাধীন' নাগরিকদের অবকাশের সুযোগ দিত
- গৃহস্থালীর কর্ম মহিলারা করতেন ও পুরুষরা এই দায়িত্ব থেকে মুক্ত
- নাগরিকত্বের সংকীর্ণ ভিত্তি।

হেল্ড বলেছেন যে ব্যক্তি অপেক্ষা রাষ্ট্রের স্বার্থকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হত ("The claims of the state were given a unique priority over those of the individual citizen.")

Model IIa: সংরক্ষণমূলক প্রজাতন্ত্র বা সাধারণতন্ত্র (Protective Republicanism)

সংরক্ষণমূলক সাধারণতন্ত্রীরা বিশ্বাস করতেন যে স্বাধীনতা রক্ষার জন্য রাজনৈতিক অংশগ্রহণ আবশ্যিক। প্রাচীন রোমে এরূপ স্বশাসিত সমাজের প্রজাতান্ত্রিক ধারণা দেখা যেত। হেল্ড ম্যাকিয়াভেলি, মন্তেস্কু ও ম্যাডিসনের চিন্তার মধ্যে সংরক্ষণমূলক প্রজাতন্ত্রের উপাদান খুঁজে পেয়েছেন।

যৌক্তিকতার নীতি (Principles of Justification)

রাজনৈতিক অংশগ্রহণ হল ব্যক্তিস্বাধীনতার আবশ্যিক শর্ত, নাগরিকেরা যদি নিজেরা নিজেদের শাসন না করে তাহলে তারা অন্যদের দ্বারা শাসিত হবে।

মূল বৈশিষ্ট্য (Key features)

- মিশ্র সংবিধান— জনগণ, অভিজাত শ্রেণি ও রাজতন্ত্রের মধ্যে ভারসাম্য
- নাগরিকদের অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্ব
- বিভিন্ন প্রতিযোগী সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে নিজেদের স্বার্থরক্ষার প্রচেষ্টা
- বাক্, মতপ্রকাশ ও সমিতি গঠনের স্বাধীনতা
- আইনের অনুশাসন

সাধারণ শর্ত বা ব্যবস্থাসমূহ (General Conditions)

- ক্ষুদ্র নগরসমাজ
- ধর্মীয় উপাসনার ব্যবস্থা
- নারী, শ্রমিক ও তথাকথিত 'পরনির্ভর' ব্যক্তিদের জনপরিসর থেকে সরিয়ে রাখা
- প্রতিযোগী রাজনৈতিক সংগঠনগুলির মধ্যে তীব্র দ্বন্দ্ব।

Model IIb: উন্নয়নমূলক সাধারণতন্ত্র (Developmental Republicanism)

পাডুয়ার মাসিলিও, রুশো, ওলস্টোনক্রাফট প্রমুখের লেখায় হেল্ড এর উপাদান লক্ষ্য করেছেন।

যৌক্তিকতার নীতি (Principles of Justification)

নাগরিকেরা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সাম্য উপভোগ করবেন যাতে কেউ কারুর ওপর প্রভুত্ব করতে না পারে এবং আত্মবিকাশের অন্তরায় সৃষ্টি না হয়।

মূল বৈশিষ্ট্য (Key features)

- মিশ্র আইনগত ও প্রশাসনিক কাজের মধ্যে পার্থক্য
- আইনসভা ও জনসভায় নাগরিকদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ
- রাষ্ট্রীয় বিষয়ে ঐকমত্য কাম্য তবে মতানৈক্য থাকলে সংখ্যাগরিষ্ঠের মত প্রাধান্য পাবে
- ম্যাজিস্ট্রেট বা প্রশাসকের হাতে শাসনবিভাগীয় ক্ষমতা
- প্রত্যক্ষ নির্বাচন বা লটারির দ্বারা প্রশাসকদের নিয়োগ

Scanned by CamScanner

সাধারণ শর্ত বা ব্যবস্থাসমূহ (General Conditions)

- ক্ষুদ্র সম্প্রদায় যেখানে শিল্পের বিকাশ কম
- নাগরিকত্ব নির্ভর করে সম্পত্তি ভোগদখলের ওপর তবে সম্পত্তির কেন্দ্রীকরণ থাকে না
- গৃহস্থালির কর্ম মহিলাদের উপর ন্যস্ত যাতে করে 'স্বাধীন' পুরুষেরা রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে পারে।

Model IIIa: সংরক্ষণমূলক গণতন্ত্র (Protective Democracy)

অধ্যাপক ডেভিড হেল্ডের মতে উদারনৈতিক গণতন্ত্র (Liberal Democracy)-এর যাত্রাপথ ছিল সমস্যাসঙ্কুল। ইতিহাসের নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে উদারনৈতিক গণতন্ত্রের আবির্ভাব হয়েছে। এসকলের মধ্যে রয়েছে রাজতন্ত্র ও এস্টেট (estate) গুলির মধ্যে লড়াই, অত্যধিক করের বোঝার বিরুদ্ধে কৃষক বিদ্রোহ, বাণিজ্য ও বাজারের বিস্তার, প্রযুক্তির উন্নতি, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও স্পেনে রাজতন্ত্রের ক্ষমতার প্রসার; নবজাগরণ ও রেনেসাঁস সংস্কৃতির প্রসার, চার্চ ও রাষ্ট্রের বিবাদ, ধর্মসংস্কার আন্দোলন, হবস ও লকের চিন্তাধারা— এসমস্ত কিছুই ইউরোপে গণতন্ত্রের বিবর্তন ও বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যদিও উদারনীতিবাদ বা liberalism একটি বিতর্কিত ধারণা, হেল্ড এটিকে ব্যবহার করেছেন এমন একটি মতাদর্শগত ব্যবস্থা হিসেবে যা স্বৈরাচারের বিরোধী এবং যা পছন্দ, যুক্তিবোধ ও সহনশীলতার মূল্যবোধের ওপর গুরুত্ব দেয়। হেল্ড বলেছেন, "While it (liberalism) is a controversial concept and its meaning has shifted historically, it is used here to signify the attempt to uphold the values of freedom of choice, reason and toleration in the face of tyranny . . ."(Models of Democracy, 3rd ed, p. 59)

হেল্ড উদারনৈতিক গণতন্ত্রের দুটি প্রতিরূপের কথা বলেছেন: একটি হল সংরক্ষণমূলক গণতন্ত্র (Protective Democracy) এবং অপরটি উন্নয়নমূলক বা বিকাশমূলক গণতন্ত্র (Developmental Democracy)।

ইংরেজ দার্শনিক জন লককেই হেল্ড সংরক্ষণমূলক গণতন্ত্রের পথিকৃৎ বলে অভিহিত করেন। হেল্ড বলেছেন, "Locke's famous objection to the Hobbesian argument . . . of an indivisible authority anticipated the whole tradition of protective democracy." অর্থাৎ হবসের চূড়ান্ত কর্তৃত্বের ধারণার বিরোধিতা করে লক সংরক্ষণমূলক গণতন্ত্রের ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধ করেন। লক প্রচারিত সীমিত সরকারের ধারণা, যা ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তির স্বাভাবিক অধিকার (natural rights of life, liberty and property) সংরক্ষণের পক্ষে অপরিহার্য, তা প্রকৃতপক্ষে সংরক্ষণমূলক গণতন্ত্রের প্রতিরূপের সূচনা করে এবং পরবর্তীকালে জেরিমি বেন্থাম, জেমস মিলের উপযোগিতাবাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ইংল্যান্ডের রাজনৈতিক মতাদর্শে রূপান্তরিত হয়। এইভাবে মূলত লক্, মন্তেস্কু, জেমস মিল, বেন্থাম, ম্যাডিসন প্রমুখের প্রচেষ্টায় সংরক্ষণমূলক গণতন্ত্রের প্রতিরূপটি গড়ে ওঠে।

যৌক্তিকতার নীতিসমূহ (Principles of Justification)

হেল্ড-এর মতে, "Citizens require protection from the governors, as well as from each other, to ensure that those who govern pursue policies that are commensurate with citizens' interests as a whole." অর্থাৎ সংরক্ষণমূলক গণতন্ত্রের ধারণার মধ্যে এই ধারণা নিহিত যে নাগরিকেরা শাসকের কাছ থেকে সংরক্ষণের প্রয়োজন বোধ করে। শুধুমাত্র শাসকদের কাছ থেকেই নয়, অন্যান্যদের কাছ থেকেও নাগরিকদের এই সংরক্ষণ দরকার হয়। সংরক্ষণের প্রয়োজন এই কারণেই হয় যে যারা শাসন করেন যেন তাদের অনুসৃত নীতিগুলি নাগরিকদের স্বার্থগুলির সঙ্গে মোটের ওপর সঙ্গতিসম্পন্ন হয়।

মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ (Key features)

- সার্বভৌমিকতা চূড়ান্তভাবে জনগণের মধ্যে নিহিত, কিন্তু তা সেই সকল জনপ্রতিনিধিদের উপর ন্যস্ত যারা আইনসঙ্গতভাবে রাষ্ট্রের ক্ষমতাসমূহকে ব্যবহার করেন।
- নিয়মিত নির্বাচন, গোপন ভোটদান, বিভিন্ন গোষ্ঠী, সম্ভাব্য নেতা অথবা দলসমূহের মধ্যে প্রতিযোগিতা এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন হল শাসকদের দায়বদ্ধতা প্রতিষ্ঠার প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি।
- রাষ্ট্রক্ষমতা অবশ্যই হবে নৈর্ব্যক্তিক অর্থাৎ আইনানুসারে পরিচালিত এবং সেই ক্ষমতা শাসনবিভাগ, আইনবিভাগ ও বিচারবিভাগের মধ্যে যেন বিভক্ত থাকে।
- রীতিনীতিহীন বা স্বৈরী ব্যবহার থেকে স্বাধীনতার নিশ্চয়তা এবং রাজনৈতিক ও পৌর অধিকারসমূহ অথবা স্বাধীনতাসমূহের আকারে আইনের চোখে সমতা এবং সর্বোপরি অবাধে কথা বলার ও মতামত প্রকাশের, সংঘ গঠনের, ভোটদানের এবং বিশ্বাসের স্বাধীনতা ও অধিকার সমতার নিশ্চয়তার জন্য সাংবিধানিকতা বা নিয়মতান্ত্রিকতার কেন্দ্রীয় স্থানের স্বীকৃতি থাকবে।

Scanned by CamScanner

- সংরক্ষণমূলক গণতন্ত্রের অন্যতম মুখ্য বৈশিষ্ট্য হল রাষ্ট্রের থেকে পৌর সমাজের পৃথকীকরণ। অর্থাৎ রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র সাধারণভাবে এমন একটা কাঠামো সৃষ্টির মধ্যে কঠোরভাবে সীমাবদ্ধ থাকবে যা অগ্রহণযোগ্য সামাজিক আবরণ ও হিংসার বিপদ থেকে মুক্ত থেকে নাগরিকদের তাদের ব্যক্তিগত জীবনধারা অনুসরণ করার সুযোগ দেবে এবং তাদের জীবনের উপর অবাঞ্ছিত রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ নিয়ন্ত্রণ করবে।
- প্রতিযোগী ক্ষমতা কেন্দ্রসমূহ এবং স্বার্থ গোষ্ঠীসমূহের অস্তিত্ব থাকবে।

সাধারণ শর্ত বা অবস্থাসমূহ (General Conditions)

- রাজনৈতিকভাবে স্বাতন্ত্র্যসম্পন্ন পৌর সমাজের বিকাশ
- উৎপাদনের উপায়সমূহের ব্যক্তিগত মালিকানা
- প্রতিযোগিতাপূর্ণ বাজার অর্থনীতি
- পিতৃতান্ত্রিক পরিবার ব্যবস্থা
- জাতীয় রাষ্ট্রের প্রসারিত ভূখণ্ডগত এলাকা।

এককথায়— সংরক্ষণমূলক গণতন্ত্রের মূলকথা হল গণতন্ত্রের লক্ষ্য হচ্ছে জনগণকে রক্ষা করা। জনসাধারণের স্বার্থ, স্বাধীনতা ও অধিকার রক্ষা করাই হচ্ছে গণতন্ত্রের মূলকথা। এর জন্য দরকার হল রাষ্ট্রক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করা। হেল্ড মনে করেন, ম্যাডিসন, বেন্থাম ও মিলের বক্তব্যে উদার গণতন্ত্রের সংরক্ষণমূলক তত্ত্বের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিশদ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। তাঁদের বক্তব্যের সারকথা হল— শাসকেরা অবশ্যই শাসিতদের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক উপায়ে শাসকদের সেই দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করতে হবে। এসবের মধ্যে রয়েছে গোপন ব্যালটে নির্বাচন, নিয়মিত নির্বাচন, সম্ভাব্য জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে প্রতিযোগিতা ইত্যাদি। এগুলি রাজনৈতিক সিদ্ধান্তসমূহকে পছন্দ করা ও নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে নাগরিকদের হাতে সন্তোষজনক হাতিয়ার অর্পণ করে। এর ফলে কর্তৃত্ব ও ব্যক্তিস্বাধীনতার মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই সংরক্ষণমূলক গণতন্ত্র হল মূলত গণ-সংরক্ষণের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপক।

Model IIIb: উন্নয়নমূলক বা বিকাশমূলক গণতন্ত্র (Developmental Democracy)

বিকাশমূলক গণতন্ত্রের মূল প্রবক্তা হলেন উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজ দার্শনিক জন স্টুয়ার্ট মিল। হেল্ড বলেছেন, "John Stuart Mill was a clear advocate of democracy, preoccupied with the extent of individual liberty in all spheres of human endeavour"। তিনি বিশ্বাস করতেন ব্যক্তিত্বের স্বাধীন বিকাশের জন্য গণতন্ত্র প্রয়োজন। রাজনৈতিক জীবনে অংশগ্রহণ করা— ভোটদান করা, স্থানীয় প্রশাসনে অংশগ্রহণ, জুরি ব্যবস্থায় যোগদান— এসব কাজই গুরুত্বপূর্ণ কারণ এর দ্বারা একটি সুশিক্ষিত ও তথ্যসমৃদ্ধ নাগরিকত্বের সৃষ্টি হয় যা গণতন্ত্রের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয়। মিল এই ধারণা পোষণ করতেন যে গণতান্ত্রিক রাজনীতি হল নৈতিক আত্মবিকাশের একটি প্রাথমিক হাতিয়ার। উদার গণতন্ত্র বা প্রতিনিধিমূলক সরকারের প্রয়োজন শুধুমাত্র ব্যক্তির সন্তোষবিধানের জন্য নয়, বরং ব্যক্তিত্বের অবাধ বিকাশের জন্যই এর প্রয়োজন রয়েছে। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে এক সচেতন ও বিকশিত নাগরিক সমাজ (citizenry)। এর ফলে এক গতিশীল বিকশিত রাজনৈতিক ব্যবস্থারও উদ্ভব ঘটে।

জন স্টুয়ার্ট মিল মনে করতেন ব্যক্তির উপর সরকারের অযথা নিয়ন্ত্রণ ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বিকাশকে ব্যাহত করে। তিনি তাঁর On Liberty নামক রচনায় ব্যক্তিকে চিন্তা ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা দেবার পক্ষে মতপ্রকাশ করেছিলেন। তিনি ব্যক্তির আচরণের স্বাধীনতাকে আরও বেশি গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন, "Over himself, over his body and mind the individual is sovereign." অর্থাৎ নিজের ওপর, নিজের শরীর ও মনের ওপর ব্যক্তি হল সার্বভৌম। তাই তিনি ব্যক্তির 'আত্মকেন্দ্রিক কাজে'র (self-regarding acts) উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণকে অকাম্য বলে মনে করেছিলেন। তাঁর মতে স্বৈরী ক্ষমতা এবং অতিমাত্রায় ক্ষমতাশালী রাষ্ট্র হল বিপদজনক। এইরূপ ব্যবস্থাধীনে মানবিক মর্যাদা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং সামাজিক ন্যায়বিচার বিপদগ্রস্ত হয়। এইরূপ পরিস্থিতিতে মানুষ তার কাজকর্মের সর্বোচ্চ মাত্রার সুবিধাজনক পরিণামসমূহের উপভোগ থেকে বঞ্চিত হয়।

এই সকল কারণেই মিল তাঁর Considerations on Representative Government গ্রন্থে প্রতিনিধিমূলক সরকারের স্বপক্ষে যুক্তি প্রদান করেছেন। তাঁর মতে এই ধরনের শাসনব্যবস্থাতেই ব্যক্তি তাঁর নিজের সামর্থ্যের বাস্তবায়ন করতে পারে এবং তার সৃজনশীল সম্ভাবনার ও সামর্থ্যের ব্যবহার করতে পারে। এই ধরনের শাসনব্যবস্থায় জনগণ তাদের শাসক ও আইন প্রণয়নকারীদের পছন্দ করে নেওয়ার ক্ষেত্রে যৌথভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে। এর মধ্য দিয়ে তারা তাদের বুদ্ধি ও বিচক্ষণতাকেও প্রয়োগ করতে পারে। তাদের অস্তিত্বের অবস্থা নির্ধারণের জন্য সক্রিয়ভাবে জড়িত হবার সুযোগ প্রদান করে।

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার মধ্য দিয়ে মানবিক যুক্তিবাদের চর্চা ও নৈতিক বিকাশ সম্ভব হয়। স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র মানুষের উৎকৃষ্টতাকে সম্ভব করে তোলে। এইরূপ শাসনব্যবস্থায় যুক্তিচর্চা এবং স্বাধীনতার রক্ষা হয়। স্বাধীনতা ও যুক্তি উভয়ের সংরক্ষণ ও বৃদ্ধির জন্য প্রতিনিধিমূলক সরকার আবশ্যিক। এতে সরকার হয়ে ওঠে দায়িত্বশীল এবং নাগরিকেরা হয়ে ওঠেন তথ্যসমৃদ্ধ, সচেতন, বিকাশশীল এবং সক্রিয়। এইভাবে এই ব্যবস্থা হয় যথার্থ গণতান্ত্রিক ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহায়ক।

Scanned by CamScanner

মৌক্তিকতার নীতিসমূহ (Principles of Justification)

রাজনৈতিক জীবনে অংশগ্রহণ শুধুমাত্র ব্যক্তিস্বার্থের সংরক্ষণের জন্যই নয়, একই সঙ্গে তথ্যসমৃদ্ধ, দায়বদ্ধ এবং বিকাশশীল নাগরিকতা সৃষ্টির জন্যও প্রয়োজন। ব্যক্তির সামর্থ্যের সম্প্রসারণের জন্য রাজনৈতিক অংশগ্রহণ আবশ্যক।

মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ (Key Features)

- সর্বজনীন ভোটাধিকারসহ গণসার্বভৌমিকতা।
- প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার (নির্বাচিত নেতৃত্ব, নিয়মিত নির্বাচন, গোপন ব্যালট ইত্যাদি)।
- রাষ্ট্রক্ষমতার সীমিতকরণ ও বিভাজন, সুরক্ষা এবং ব্যক্তির অধিকারসমূহের নিশ্চিতকরণের জন্য শাসনতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণসমূহ ও সর্বোপরি সেইসব অধিকারগুলি যা চিন্তার, অনুভূতির, পছন্দ, আলোচনা, প্রকাশনা এবং ব্যক্তির পছন্দকৃত। জীবন পরিকল্পনার অনুসরণ করার জন্য প্রয়োজন তা নিশ্চিত করার জন্য সাংবিধানিক নিয়ন্ত্রণসমূহ।
- সংসদীয় সভা বা আইনসভা থেকে সরকারি আমলাদের সুস্পষ্ট সীমানা নির্ধারণ, অর্থাৎ, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের থেকে বিশেষ প্রশাসকদের কার্যাবলির পৃথকীকরণ। ভোটাধিকার প্রয়োগ, স্থানীয় শাসনব্যবস্থায় ব্যাপক অংশগ্রহণ ও জুরি ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে সরকারের বিভিন্ন শাখায় নাগরিকদের বিজড়িতকরণ।

সাধারণ শর্ত বা অবস্থাসমূহ (General Conditions)

- সর্বনিম্ন রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপসহ স্বাধীন পৌর সমাজ।
- প্রতিযোগিতামূলক বাজার অর্থনীতি।
- সামাজিক অথবা সমবায়মূলক মালিকানা ব্যবস্থার পরীক্ষা-নিরীক্ষার পাশাপাশি উৎপাদনের উপায়সমূহের বেসরকারি মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ।
- নারীজাতির রাজনৈতিক মুক্তিসাধন, কিন্তু সাবেকি গার্হস্থ্য শ্রমবিভাজন মেনে নেওয়া।
- উন্নত আন্তর্জাতিক সম্পর্কসহ জাতি-রাষ্ট্রব্যবস্থা।

Model IV: প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র (Direct Democracy)

ডেভিড হেল্ডের মতে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র হল মূলত মার্কসীয় গণতন্ত্র। এই ধরনের গণতন্ত্রের মূলকথা হল "প্রত্যেকের স্বাধীন উন্নয়নই হল সকলের স্বাধীন উন্নয়নের শর্ত।" হেল্ডের ভাষায়, "The free development of all can only be achieved with the free development of each." স্বাধীনতার জন্য প্রয়োজন শোষণের অবসান এবং সম্পূর্ণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সাম্যের প্রতিষ্ঠা। এই ধরনের গণতন্ত্র পীড়নমূলক রাষ্ট্রযন্ত্রের বিলুপ্তি ও সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণিভেদ, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও বাজার অর্থনীতির বিলোপসাধনের উপর গুরুত্ব দেয়। এই ধরনের গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য ও শর্তের মধ্যে রয়েছে বিশেষ শ্রেণির সুযোগসুবিধার অবসান, উৎপাদনের উপকরণের সামাজিকীকরণ ইত্যাদি।

Model V: প্রতিযোগিতামূলক এলিট বা প্রবরবাদী গণতন্ত্র (Competitive Elitist Democracy)

মুষ্টিমেয় বাছাই করা ব্যক্তি বা এলিটদের নিয়ন্ত্রণাধীন গণতন্ত্রকেই Competitive Elitist Democracy বলা হয়। হেল্ডের মতে এই ধরনের গণতন্ত্রের মূল বৈশিষ্ট্য হল সংসদীয় গণতন্ত্রে সুদৃঢ় শাসনবিভাগ, বিভিন্ন রাজনৈতিক এলিট বা প্রবরশ্রেণির মধ্যে প্রতিযোগিতা, রাজনৈতিক নেতৃত্বের কেন্দ্রীয় ভূমিকা, একটি স্বাধীন ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আমলাতন্ত্র ও সংসদীয় গণতন্ত্রের সক্রিয়তা। এই ধরনের রাজনীতিতে আধুনিক শিল্পসমাজ (industrial society) সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। Competitive Elitist Democracy-র তাত্ত্বিকদের মধ্যে রয়েছেন ম্যাক্স ওয়েবার ও জোসেফ স্যুমপিটার।

Model VI: বহুত্ববাদ (Pluralism)

রবার্ট ডাল, ডেভিড ট্রুম্যান প্রমুখ বহুত্ববাদী গণতন্ত্র বা Pluralist Democracy-র কথা প্রচার করেছেন। এঁদের মতে আধুনিক সমাজ হল জটিল ও বহুত্ববাদী। এই ধরনের সমাজে বহু গোষ্ঠী সংগঠন, দল ও শ্রেণির মধ্যে সমন্বয়ের ভিত্তিতে এক মিশ্র বহুমুখী শাসনব্যবস্থা গড়ে ওঠে। প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচন, স্বার্থগোষ্ঠীগুলির স্বাধীন ভূমিকা, নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের নীতি বহুত্ববাদী গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য। রবার্ট ডাল 'polyarchy'-র কথা বলেছেন— বিভিন্ন গোষ্ঠীস্বার্থের মধ্যে প্রতিযোগিতা এর প্রধান লক্ষ্য।

Model VII: আইনগত গণতন্ত্র (Legal Democracy)

আইনগত গণতন্ত্রের প্রবক্তা হলেন নব্য উদারনীতিবাদী এফ.এ. হায়েক (F.A. Hayek), রবার্ট নোজিক (Robert Nozick) প্রমুখ রাষ্ট্রদার্শনিকেরা। সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন, মুক্ত বাজার ও উদার অর্থনীতি, সাংবিধানিক শাসন, সীমিত রাষ্ট্র ইত্যাদি হল আইনগত গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য। হেল্ড উল্লেখ করেছেন, "Minimal state intervention in civil society and private life."।

Scanned by CamScanner

নব্য-দক্ষিণপন্থার প্রভাবে সংরক্ষণমূলক গণতন্ত্রের একটি উপপ্রতিরূপ (sub-model) হিসাবে 'আইনগত গণতন্ত্র' বা 'Legal Democracy'-র ধারণাটি গড়ে উঠেছে। এই প্রতিরূপটি অর্থনৈতিক জীবনের মতো, রাজনৈতিক জীবনেও ব্যক্তির স্বাধীনতার সঙ্গে উদ্যোগের মিলন ঘটাতে চায়। আবার, গণতন্ত্রের এই প্রতিরূপটি ব্যক্তিস্বাধীনতা ও উদ্যোগের স্বার্থে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনের সীমানাকে আইনের অনুশাসনের দ্বারা বেঁধে দিতে চায়।

অধ্যাপক ডেভিড হেল্ড আইনগত গণতন্ত্রের কয়েকটি প্রধান বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করেছেন। এগুলি হল— (ক) সাংবিধানিক রাষ্ট্র (সাংবিধানিক রাষ্ট্র বলতে হেল্ড ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণসহ ইঙ্গ-মার্কিন রাজনৈতিক ঐতিহ্যানুযায়ী বৈশিষ্ট্যসমূহকে বুঝিয়েছেন), (খ) আইনের অনুশাসন, (গ) পৌর সমাজ ও ব্যক্তিগত জীবনে সর্বনিম্ন রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ এবং (ঘ) মুক্ত-বাজার ভিত্তিক সমাজের পূর্ণতম সম্ভাব্য ক্ষেত্র। এঁরা 'interventionist welfare state'-এর বিরোধিতা করেন।

হেল্ড-এর মতে নব্য-দক্ষিণপন্থীদের আইনগত গণতন্ত্র (legal democracy) খুব একটা উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ধারণা বহন করে না। এবং যে সকল সরকার এই ধারণাকে কার্যকর করবে তারা সমস্যার সম্মুখীন হবে। তিনি মনে করেন ব্যক্তিসমূহকে মুক্ত ও সমান হতে গেলে অথবা গণতন্ত্র যদি ব্যক্তিসমূহের জীবনের কাঠামো নির্ধারণকারী সমান সুযোগসুবিধার জোগানকে বোঝায় তাহলে একগুচ্ছ বণ্টন সংক্রান্ত প্রশ্নের কথা বিবেচনা করা দরকার। কিন্তু নব্য-দক্ষিণপন্থী মডেল সেগুলির বিবেচনাকে অসঙ্গতভাবে উপেক্ষা করেছে।

হেল্ড বলেছেন, "The New Right strategy of 'rolling back' the state . . . is unlikely to work over a long period." (Models of Democracy, p. 208)

Model VIII: অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্র (Participatory Democracy)

বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশক থেকে 'নব্য বাম' (New left) উদ্ভূত হয়ে যে গণতন্ত্রের ধারণা সৃষ্টি করেছে অধ্যাপক ডেভিল হেল্ড তাকে 'অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্র' আখ্যা দিয়েছেন। নব্য বাম চিন্তাবিদরূপে বিশেষ করে ক্যারল প্যাটম্যান (Carole Pateman), সি.বি. ম্যাকফারসন (C.B. Macpherson) এবং এন. পৌলান্‌তাজ্‌ (N. Poulantzas)-এর নাম উল্লেখযোগ্য।

অধ্যাপক প্রলয়দেব মুখোপাধ্যায় বলেছেন যে অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্র সম্পর্কে নব্য বামেদের ধারণা তিনটি উৎসের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। এগুলি হল: (১) ধ্রুপদী এথেনীয় গণতন্ত্রের ধারণা, (২) গণতন্ত্র সম্পর্কে রুশোর ধারণা এবং (৩) প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র সম্পর্কে মার্কসীয় ধারণা। হেল্ড বলেছেন, "Participatory democracy was, from the early 1970s to (at least) the early 1990s, the leading counter-model on the left to the legal democracy of the right."। অর্থাৎ নব্য-দক্ষিণপন্থীদের আইনগত গণতন্ত্রের বিকল্প মডেলরূপে ১৯৭০ থেকে অন্তত ১৯৯০-এর দশক পর্যন্ত নব্য বামেদের অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্র প্রসার লাভ করে।

নব্য বাম মতধারায় সমসাময়িক উদার গণতন্ত্রের দুটি ধারণা সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলা হয়েছিল। প্রথমটি হল উদার গণতান্ত্রিক চিন্তাধারার মধ্যে নিহিত এই ধারণা যে ব্যক্তিসমূহ হল 'মুক্ত এবং সমান' (free and equal)। ক্যারল প্যাটম্যান (Carole Pateman) মনে করেন উদার গণতন্ত্রের তত্ত্ব 'মুক্ত ও সমান' ব্যক্তির যে ধারণা প্রচার করে বাস্তবে তা কদাচিৎ দেখা যায়। সি.বি. ম্যাকফারসনও (C.B. Macpherson) মনে করেন যে বহু ব্যক্তিই রাজনৈতিক পৌরজীবনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ থেকে পদ্ধতিমাফিকভাবে বঞ্চিত হন। শ্রেণিগত, লিঙ্গগত, জাতিগত বাস্তব অসমতা 'মুক্ত এবং সমান' ব্যক্তির ন্যায়সঙ্গত দাবিকে বাধা প্রদান করে।

দ্বিতীয় যে উদারনৈতিক ধারণাটি সম্পর্কে নব্য বামেরা প্রশ্ন তুলেছেন তা হল পৌরসমাজ এবং রাষ্ট্রের মধ্যেকার একটি সুস্পষ্ট পৃথকীকরণের ধারণা। প্যাটম্যানের মতে, এই পৃথকীকরণের ধারণাটি ত্রুটিপূর্ণ এবং গ্রহণযোগ্য নয়। তাঁর মতে রাষ্ট্র যদি সংঘসমূহ ও প্রাত্যহিক জীবনের বাস্তবতা থেকে পৃথক হয় তবে তার ভূমিকা হল নিরপেক্ষ আম্পায়ার বা বিচারকের মতো এবং সে ক্ষেত্রে রাষ্ট্র নাগরিকদের শ্রদ্ধা ও আনুগত্য লাভের যোগ্য। কিন্তু বিপরীত দিকে যদি রাষ্ট্র এসবের মধ্যে মিশে থাকে তাহলে তার কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার নিরপেক্ষতা বহুলাংশে বিনষ্ট হয়। শুধু তাই নয় প্যাটম্যান মনে করেন যে সেক্ষেত্রে রাষ্ট্র প্রাত্যহিক জীবনে অসমতাসমূহের সংরক্ষণ ও পুনরুৎপাদনের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে পড়ে এবং তার আনুগত্যের দাবির ভিত্তি সন্দেহাতীত থাকে না। এ অবস্থায় নাগরিকেরা 'মুক্ত এবং সমান' বলে বিবেচিত হন না।

নব্য বামেরা রাষ্ট্রের আরও গণতন্ত্রীকরণ চান। পার্লামেন্ট, রাষ্ট্রীয় আমলাতন্ত্র, রাজনৈতিক দল এগুলিকে আরও দায়বদ্ধ হতে হবে। ম্যাকফারসন মনে করেন যে গণতন্ত্রকে ফলপ্রসূ করার জন্য রাজনৈতিক দলগুলিকে প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক আদর্শ অনুসারে সংগঠিত করা প্রয়োজন। হেল্ড বলেছেন, "Macpherson argued for transformation based upon a system of combining competitive parties and organizations of direct democracy." অর্থাৎ প্রতিযোগিতামূলক দলব্যবস্থা ও প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠানগুলির সমন্বয় সাধনের ওপর ম্যাকফারসন গুরুত্ব আরোপ করেছেন। অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্রের প্রধান উপাদানগুলি নিম্নরূপ:

Scanned by CamScanner

ন্যায়সঙ্গত বা যথার্থতার নীতি (সমূহ)

স্বাধীনতার ও আত্মবিকাশে সমানাধিকার কেবলমাত্র অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্রেই অর্জিত হতে পারে। এইরকম সমাজ কার্যকারিতার অনুভূতিকে বিকশিত করে। এইরূপ গণতন্ত্র সমষ্টিগত সমস্যাবলির জন্য চিন্তার বিকাশ ঘটায়, জ্ঞানসমৃদ্ধ নাগরিক মণ্ডলী গঠন করতে সাহায্য করে, যে নাগরিক মণ্ডলী শাসন প্রক্রিয়ার স্থায়ী আগ্রহ প্রদর্শন করতে সমর্থ।

মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ (Key Features)

- কর্মক্ষেত্র ও স্থানীয় ক্ষেত্রগুলিসহ সমাজের মূল প্রতিষ্ঠানসমূহের নিয়ন্ত্রণে নাগরিকদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ।
- দলীয় কর্মকর্তাদের দলীয় সদস্যদের কাছে প্রত্যক্ষভাবে দায়বদ্ধ করে দলীয় ব্যবস্থার পুনর্গঠন।
- সংসদ অথবা কংগ্রেসের অর্থাৎ আইনসভার কাঠামোয় অংশগ্রহণমূলক দলসমূহ কার্যকর করে তোলা।
- রাজনৈতিক ধরন নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষার সম্ভাবনাকে নিশ্চিত করার জন্য এক উন্মুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা বজার রাখার সাধারণ অবস্থানসমূহ।
- সাধারণ বস্তুগত সম্পদের পুনর্বণ্টনের মাধ্যমে বহু সামাজিক গোষ্ঠীর স্বল্প সম্পদ-ভিত্তিক প্রত্যক্ষ উন্নয়ন।
- সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রে দায়বদ্ধতাহীন ক্ষমতা হ্রাসকরণ এবং সম্ভব হলে মূলোৎপাটন।
- তথ্যসমৃদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য এক উন্মুক্ত তথ্য ব্যবস্থা। মহিলা এবং পুরুষেরা যাতে জনজীবনে অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করতে পারে সেজন্য শিশুবিকাশ ব্যবস্থার পুনর্বিবেচনা।

উদারনৈতিক গণতন্ত্রের ঐতিহাসিক বিবর্তন প্রক্রিয়া রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপ ও রাজনীতিতে জনগণের ফলপ্রসূ অংশগ্রহণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেয় বলে অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্রের অবদান ও গুরুত্বকে স্বীকার করতে হয়।

ডেভিড হেল্ড বলেছেন যে ম্যাকফারসন ও প্যাটম্যান উদারনীতিবাদ ও মার্কসবাদী ঐতিহ্যের সমন্বয় করে ও পুনর্গঠন ঘটিয়ে গণতন্ত্রের বিতর্কে এক অভিনব সংযোজন করেছেন, কিন্তু কীভাবে অর্থনীতিকে সংগঠিত করতে হবে, প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠানগুলিকেই বা কীভাবে কার্যকরী করতে হবে এবং পরিবর্তনশীল আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাকেই বা কীভাবে মোকাবিলা করা হবে এসকল প্রশ্নের তাঁরা সদুত্তর দিতে পারেননি।

হেল্ড বলেছেন, "Their arguments pass over the question of how their model could be realized . . ."। অর্থাৎ মডেলটি বাস্তবায়িত করার সমস্যাটি তাঁরা এড়িয়ে গেছেন।

Model IX: বিতর্ক, আলোচনা বা চর্চাকেন্দ্রিক গণতন্ত্র (Deliberative Democracy)

তথ্যপ্রযুক্তিকে ব্যবহার করে এবং একটি সক্রিয় নাগরিক সমাজ তৈরি করে গণতন্ত্রকে আরও অংশীদারী করে তোলা এর উদ্দেশ্য। ইন্টারনেট, টেলিভিশন, রেডিও ইত্যাদির মাধ্যমে জনগণকে রাজনৈতিক আলাপ আলোচনায় আরও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে অনুপ্রাণিত করা ও বিতর্কিত বিষয়গুলি সম্পর্কে নাগরিকদের মতামত দিতে আগ্রহান্বিত করা Deliberative Democracy-র উদ্দেশ্য। E-democracy-র ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

Model Xa: গণতান্ত্রিক স্বাতন্ত্র্য (Democratic Autonomy)

হেল্ড বলেছেন, "Autonomy connotes the capacity of human being to reason self-consciously, to be self-reflective and to be self-determining." অর্থাৎ স্বাতন্ত্র্য বলতে বোঝায় আত্মসচেতন ভাবে যুক্তিবোধ দিয়ে কোনো বিষয় অনুধাবন করা ও নিজে সিদ্ধান্তগ্রহণ ও নির্ধারণের সামর্থ্য। শুধুমাত্র নির্বাচনে অংশগ্রহণ নয়, তথ্যসমৃদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতার ওপর এখানে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

Model Xb: বিশ্বজনীন গণতন্ত্র (Cosmopolitan Democracy)

ডেভিড হেল্ডের মতে বিশ্বায়ন বিভিন্ন দেশ ও জনগণের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর সংহতিসাধন করেছে। বিশ্বায়নের কার্যকলাপ, মিথস্ক্রিয়া ও ক্ষমতার আন্তর্মহাদেশীয় কিংবা আন্তঃআঞ্চলিক প্রবাহ ও নেটওয়ার্ক এক 'সীমানাহীন বিশ্ব' (Borderless World) সৃষ্টি করেছে। তাঁর ভাষায়, "Globalization has brought large swathes of the world population 'closer together' in overlapping communities of fate . . . Transnational movements, agencies and corporations have established the first stage of a global civil society. These, and related developments, create anchors for the development of cosmopolitan society." অর্থাৎ বিশ্বায়নের সর্বব্যাপী প্রভাব, দেশের সংকীর্ণ গণ্ডী মুছে ফেলে

Scanned by CamScanner

পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি করা, অতিজাতীয় আন্দোলন, যোগাযোগের বিপ্লব, সময় ও দূরত্বের হ্রাস, রাষ্ট্রের ভূকেন্দ্রিকতার বিলোপসাধন, বিশ্বের এক প্রান্তের মানুষের সঙ্গে অন্যান্য প্রান্তের মানুষের যোগাযোগ, সার্বভৌমিকতার চিরায়ত ধারণার পরিবর্তন, সার্বিক যোগাযোগ, বহুসংস্কৃতিবাদ, পারস্পরিক প্রভাব-প্রতিক্রিয়ার উদারতা ও নির্ভরশীলতা এক বিশ্বজনীন গণতন্ত্র বা Cosmopolitan Democracy-র সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে বলে হেল্ড আশা প্রকাশ করেছেন। একটি global civil society বা বিশ্ব নাগরিক সমাজের সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে।

হেল্ড এই Cosmopolitan Democracy বা বিশ্বজনীন গণতন্ত্রের কয়েকটি স্বল্পমেয়াদি (short-term) ও দীর্ঘমেয়াদি (long-term) সম্ভাব্য বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করেছেন:

স্বল্পমেয়াদি মূল বৈশিষ্ট্য	দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা
• রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কার সাধন; উন্নয়নশীল দেশগুলিকে সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত করা	• অধিকার ও কর্তব্যের নয়া সনদ যাতে করে বিশ্বের মানুষের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন হয়
• রাষ্ট্রসংঘের একটি দ্বিতীয় কক্ষ গড়ে তোলা	• একটি বিশ্ব পার্লামেন্ট প্রতিষ্ঠা
• আঞ্চলিক সংহতির প্রসার	• রাষ্ট্রীয় খরচায় নির্বাচন ও চর্চাকেন্দ্রিক সংসদের পরিচালনা
• একটি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার বিচারালয় স্থাপন	• বিশ্বব্যাপী একই দেওয়ানি ও ফৌজদারি আইনি ব্যবস্থা
• একটি আন্তর্জাতিক দায়বদ্ধ সেনাবাহিনী গড়ে তোলা	• রাষ্ট্রের বলপ্রয়োগের খানিকটা ক্ষমতা ক্ষমতা আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংগঠনকে হস্তান্তর করে দেওয়া

হেল্ড স্বীকার করেছেন এটি হয়তো একটি 'utopian project'—cosmopolitan democracy-র পথে অনেক বাধা আছে। আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ, আর্থিক বৈষম্য ইত্যাদি, কিন্তু সময় এসেছে "to rethink democracy for a more global age"। (ঋণস্বীকার: গণতন্ত্র সম্পর্কে হেল্ডের শ্রেণিবিভাগ রচনায় হেল্ডের *Models of Democracy* (3rd ed.) এবং অধ্যাপক প্রলয়দেব মুখোপাধ্যায়ের 'রাষ্ট্র ও রাজনীতি' বই দুটির সাহায্য নেওয়া হয়েছে)

কর্তৃত্ববাদ (Authoritarianism)

গণতন্ত্রের বিপরীত শাসনব্যবস্থা হল কর্তৃত্ববাদ। Andrew Heywood তাঁর Key Concepts in Politics গ্রন্থে এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন: "Authoritarianism is a belief in, or the practice of, government 'from above', in which political rule is imposed, upon society regardless of its concept." অর্থাৎ কর্তৃত্ববাদ হল ওপর থেকে সরকারি ক্ষমতা চাপিয়ে দেবার একটা বিশ্বাস বা প্রক্রিয়া, তা সে সমাজের সম্মতি থাক বা না থাক। চূড়ান্ত রাজতন্ত্র, সামরিক শাসন, একনায়কতন্ত্র— সবই কর্তৃত্ববাদের দৃষ্টান্ত। Franco-র স্পেন, Juan Peron শাসিত আর্জেন্টিনা প্রভৃতি কর্তৃত্ববাদী শাসনের উদাহরণ।

অধ্যাপক Heywood, অধ্যাপক Alan R. Ball প্রমুখকে অনুসরণ করে কর্তৃত্ববাদের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা যায়:

- 'Government from above' বা ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া শাসন এর প্রধান বৈশিষ্ট্য। জনগণের সম্মতিকে কোনো গুরুত্ব দেওয়া হয় না। এখানে কর্তৃত্ববাদ (authoritarianism)-এর সঙ্গে 'কর্তৃত্ব' (authority)-র পার্থক্য করা দরকার। 'কর্তৃত্ব' বা authority হল বৈধ ক্ষমতা (legitimate power), এখানে জনগণের স্বভাবজাত আনুগত্য বা 'consent from below' বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদিকে কর্তৃত্ববাদ হল অগণতান্ত্রিক চাপিয়ে দেওয়া শাসন। জনমত এখানে উপেক্ষিত।
- কর্তৃত্ববাদে ব্যক্তিস্বাধীনতার ওপর কোনো গুরুত্ব দেওয়া হয় না। কর্তৃত্ববাদ জনগণের কাছ থেকে অন্ধ আনুগত্য দাবি করে। অধ্যাপক অশোককুমার সরকার বলেছেন, "কর্তৃত্ববাদ এমন এক শাসনব্যবস্থা যেখানে শাসক শাসিতের প্রশ্নাতীত আনুগত্য দাবি করে।" প্রয়োজনে শাসকগোষ্ঠী জনমতকে উপেক্ষা করে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে তাদের কর্তৃত্ব কায়েম করে।
- বিভিন্ন গণতান্ত্রিক অধিকার যথা বাক্ ও মতপ্রকাশের অধিকার, সমবেত হবার অধিকার, সরকারকে সমালোচনার অধিকার এই ব্যবস্থায় নিষিদ্ধ।
- Alan R. Ball ও B. Guy Peters তাঁদের *Modern Politics and Government* পুস্তকের নতুন (৭ম) সংস্করণে কর্তৃত্ববাদী ব্যবস্থাকে autocracy বা স্বৈরতন্ত্র রূপে চিহ্নিত করেছেন। তাঁদের মতে এই ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে রয়েছে: (ক) প্রকাশ্য রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার ওপর নিয়ন্ত্রণ, (খ) বলপ্রয়োগের নগ্ন প্রকাশ, (গ) বিচার বিভাগীয় স্বাধীনতার অনুপস্থিতি এবং (ঘ) পৌর স্বাধীনতার

Scanned by CamScanner

সংকীর্ণতা। কর্তৃত্ববাদী ব্যবস্থার মধ্যে তাঁরা কতকগুলি উপবিভাগ করেছেন:

ক) সাবেকি রাজতন্ত্র যথা সৌদি আরব, মরক্কো, পূর্বতন নেপাল ইত্যাদি।

খ) রক্ষণশীল একনায়কতন্ত্র যেখানে শাসকের ব্যক্তিপূজা লক্ষ করা যায়।

গ) Theocracy বা ধর্মকেন্দ্রিক রাষ্ট্র যথা তালিবানি আফগানিস্তান ও ইসলামিক ইরান।

ঘ) সামরিক শাসনব্যবস্থা

বল ও গাই পিটারস্-এর মতে এই ধরনের কর্তৃত্ববাদী শাসনব্যবস্থার স্থায়িত্ব কম এবং এদের সমর্থনের ভিত্তি দুর্বল।

গ্রন্থসূত্র:

১। Ball, Alan R. and Guy Peters, B., *Modern Politics and Government (7th ed.).*

২। Heywood, Andrew, *Key Concepts in Politics.*

৩। Heywood, Andrew, *Politics.*

৪। Held, David, *Models of Democracy (3rd ed.).*

৫। মুখোপাধ্যায়, প্রলয়দেব, রাষ্ট্র ও রাজনীতি।

৬। Srinivasan, Janaki, 'Democracy' in Bhargava, R and Acharya, A (eds.) *Political Theory.*

৭। মুখোপাধ্যায়, সুরজিৎ সি., 'গণতন্ত্র' প্রবন্ধ, দাশ, দীপককুমার, সম্পাদিত রাজনীতির তত্ত্বকথা (১) গ্রন্থে সংকলিত।

৮। সরকার, অশোককুমার, সংসদ রাষ্ট্রবিজ্ঞান অভিধান।

সপ্তম অধ্যায়

নাগরিকত্ব
(Citizenship)

সাম্প্রতিককালে ভারতবর্ষ তথা বিশ্ব রাজনীতিতে নাগরিকত্ব একটি জটিল ও বিতর্কিত বিষয়ে পরিণত হয়েছে। ভারতের রাজ্য অসমে নাগরিক পঞ্জিকরণ (National Register of Citizens বা NRC) প্রক্রিয়ায় প্রায় ৪০ লক্ষ মানুষের নাম বাদ যাওয়া, ভারতে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের সমস্যা, বার্মা বা মায়ানমারের রোহিঙ্গাদের এদেশে আগমন, ইরাক, সিরিয়া, সোমালিয়া প্রভৃতি দেশে গৃহযুদ্ধের ফলে শরণার্থীদের সমস্যা— এই সমস্ত কিছু নাগরিকত্ব ইস্যুটিকে রাজনৈতিক বিতর্কের কেন্দ্রস্থলে স্থাপন করেছে। বিশ্বায়ন, অভিবাসন বা মাইগ্রেশনের সমস্যা, সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদ (multiculturalism) এই বিতর্কে নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

এই প্রবন্ধে আমরা রিচার্ড বেল্লামী (Richard Bellamy), অনুপমা রায় (ভার্গব ও আচার্য্য সম্পাদিত গ্রন্থে তাঁর 'Citizenship' শীর্ষক প্রবন্ধ), টি.এইচ. মার্শাল (T.H. Marshall), আর. বেনডিক্স (R. Bendix), ভারতের সংবিধান বিশারদ শ্রী দুর্গাদাস বসু, অধ্যাপক অশোককুমার সরকার প্রমুখ পণ্ডিতদের অনুসরণ করে নাগরিকত্বের বিষয়টি পর্যালোচনা করার চেষ্টা করব।

নাগরিকতার সংজ্ঞা (Definition of Citizenship): Oxford Dictionary of Sociology-তে বলা হয়েছে "In political and legal theory, citizenship refers to the rights and duties of the members of a nation-state or city." অর্থাৎ রাজনৈতিক ও আইনগত তত্ত্বে নাগরিকত্ব হল জাতীয় রাষ্ট্রের সদস্যদের কিছু অধিকার ও কর্তব্য। শুধু জাতীয় রাষ্ট্র নয়, তাঁরা নগরের সদস্যও হতে পারেন।

Andrew Heywood বলেছেন, "Citizenship is a relationship between the individual and the state in which the two are bound together by

reciprocal rights and duties." অর্থাৎ নাগরিকত্ব হল ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের মধ্যে একটি সম্পর্ক যেখানে উভয়েরই কিছু অধিকার ও কর্তব্য থাকে।

টি.এইচ. মার্শাল (T.H. Marshall) তাঁর Citizenship and Social Class (1950) পুস্তকে নাগরিকত্ব বলতে বুঝিয়েছেন একটি রাজনৈতিক সম্প্রদায়ে পূর্ণ ও সমানভাবে সদস্যপদ লাভের মর্যাদা ("full and equal membership in a political community")। রিচার্ড বেল্লামি (Richard Bellamy)-র মতে নাগরিকত্ব ধারণার কেন্দ্রস্থলে রয়েছে একটি রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের সদস্যপদ (Membership lies at the heart of citizenship. To be a citizen is to belong to a given political community.)। অধ্যাপিকা অনুপমা রায় এ প্রসঙ্গে কতকগুলি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন: নাগরিক বলতে কাদের বোঝায়? নাগরিকত্ব থেকে বাদ পড়েন কারা এবং কীসের ভিত্তিতে? নাগরিকতার প্রকৃতি কী? এটি কি শুধু একটি আইনগত মর্যাদা (legal status) না এর সঙ্গে রাজনৈতিক জীবনে অংশগ্রহণের একটি বিশেষ যোগ আছে? নাগরিকের সঙ্গে ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর সম্পর্ক কী? একজন দায়িত্বশীল নাগরিকের কাছে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের কী কী রাস্তা খোলা আছে? এই প্রশ্নগুলির উত্তরের মধ্যে লুকিয়ে আছে নাগরিকতার অর্থ ও প্রকৃতি।

নাগরিকত্বের উপাদান (Components of Citizenship): বেল্লামি নাগরিকত্বের তিনটি উপাদানের উল্লেখ করেছেন। এগুলি হল নিম্নরূপ:

১। একটি গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের সদস্যপদ (Membership of a Democratic Political Community): অতীতে দেখা যেত জাতি, লিঙ্গ, ব্যক্তিগত সম্পত্তির অনুপস্থিতি, শিক্ষাগত যোগ্যতার অভাব, কর্মহীনতা ও বেকারত্ব, মানসিক ভারসাম্যহীনতা, স্থায়ী বাসস্থান বা ঠিকানার অভাব ইত্যাদি নানা কারণে নানা ধরনের মানুষকে নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত করা হত। অধিকাংশ দেশে মহিলাদের ভোটাধিকার অর্জন করতে দীর্ঘ সংগ্রাম করতে হয়েছে। জেলবন্দি মানুষদের অনেক সময় ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া হয়। আধুনিক যুগে বৈষম্যের এই ভিত্তিগুলি ক্রমশ অপসারিত হচ্ছে কিন্তু এখনও নির্মূল হয়নি। দেশের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণের অধিকার নাগরিকত্বের একটি প্রধান লক্ষণ। কিন্তু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে আজও নাগরিকত্বের সঙ্গে রাজনৈতিক বৈধতার প্রশ্নটি জড়িত। Immigration বা অভিবাসন আজকের যুগে একট প্রধান সমস্যা। তাছাড়া বিশ্বায়নের যুগে শ্রমজীবী মানুষের সচলতা ও পেশাগত সচলতা (Occupational mobility) বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই রাজনৈতিক গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের বৈধ সদস্যপদ নাগরিকতা প্রদান বা অর্জনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

পালন করে। তাই বলা হয়েছে নাগরিকত্বের ধারণার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে রাজনৈতিক ও আইনি ব্যবস্থায় আনুষ্ঠানিক সদস্যপদের প্রশ্ন (At the centre of the concept of citizenship lies the question of the formal status of membership in a political and legal system)।

২। কিছু যৌথ সুযোগসুবিধা ও অধিকার যা রাজনৈতিক সমাজের সদস্য হওয়ার সূত্রে নাগরিক ভোগ করে (The collective benefits and rights associated with membership): নাগরিক মাত্রই কিছু নির্দিষ্ট অধিকার ভোগ করেন। বেল্লামি এটিকে 'defining criterion of citizenship' বা নাগরিকত্বের লক্ষণ নির্ধারণকারী উপাদান বলে চিহ্নিত করেছেন। নাগরিকদের এই অধিকারের প্রশ্নে কিছু রাষ্ট্রদার্শনিকদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। নয়া-উদারনীতিবাদী (Neo-liberal) চিন্তাবিদরা মুক্ত বাজার অর্থনীতির প্রেক্ষিতে অধিকারকে বিচার করেন। অপর দিকে Social Democrats বা সামাজিক গণতন্ত্রবাদীরা স্বাস্থ্য পরিষেবা (health care) ও সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার—এগুলির উপর জোর দেন।

৩। সমাজের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ (Participation in the Community's Political, Economic and Social Processes): নাগরিকদের কিছু 'অধিকার পাবার অধিকার' আছে (বেল্লামির ভাষায় 'right to have rights')। এখানেই রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণের অধিকারটি গুরুত্ব পায়। মানবাধিকার কর্মীরা অধিকারকে বৈধ নাগরিকত্বের সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার পক্ষপাতী নন। তাঁদের মতে মানুষ হিসেবে জন্মালেই— তা সে বৈধ নাগরিকত্ব থাক বা না থাক— প্রত্যেকের কিছু মৌলিক মানবাধিকার থাকে। নাগরিকত্বকে সেখানে অনাবশ্যক শর্ত করা সমীচীন নয়। রাজনৈতিক সীমানার সংকীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করে মানুষকে অধিকার ভোগ করতে দিতে হবে বলে তাঁরা দাবি করেন। Bellamy-র ভাষায়, "Rights should transcend the boundaries of any political community…"।

রাজনৈতিক সমাজের সদস্যপদ (membership), অধিকার (rights) এবং রাজনীতিতে অংশগ্রহণ (participation)— এই তিনটি উপাদান একত্র করে নাগরিকত্বের নিম্নলিখিত সংজ্ঞা দিয়েছেন বেল্লামি। ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার্থে নীচে সেটি বাক্স আকারে দেওয়া হল:

নাগরিকত্বের সংজ্ঞা

Citizenship is a condition of civic equality. It consists of membership of a political community where all citizens can determine the terms of social cooperation on an equal basis. This status not only secures equal collective goods provided by the political association but also involves equal duties to promote and sustain them – including the good of democratic citizenship itself. সহজ কথায় নাগরিকত্ব হল পৌর সাম্যের শর্ত। এর লক্ষণ হল একটি রাজনৈতিক সমাজের সদস্যপদ যেখানে নাগরিকেরা নিজেরা সাম্যের ভিত্তিতে সামাজিক সহযোগিতার শর্ত নির্ধারণ করতে সক্ষম হবে। নাগরিকত্বের এই মর্যাদা শুধুমাত্র রাজনৈতিক সংগঠনের যৌথ সম্পদগুলির উপভোগ করার সমঅধিকার বোঝায় না; এর সঙ্গে একটি দায়িত্বও বর্তায়— তা সামাজিক যৌথ সম্পদকে রক্ষা ও তার বিকাশ সাধন করা যাতে করে গণতান্ত্রিক নাগরিকত্ব ও তার কল্যাণ আরও সুদৃঢ় হয়। গ্রন্থসূত্র : Richard Bellamy: *Citizenship.*

নাগরিক হল রাষ্ট্রের মধ্যে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী সেই জনসংখ্যা যারা সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্র প্রদত্ত পৌর ও রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করে এবং রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে ও কর্তব্য পালন করে। নাগরিকতা ধারণার মধ্যে অধিকারের বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। Bellamy তাঁর Citizenship গ্রন্থে এই "right to have rights "-এর উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। অধিকার ভোগকারী ব্যক্তি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বসবাসকারী ব্যক্তি হিসেবে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। নাগরিকত্বের মর্যাদা মানুষ দু'ভাবে অর্জন করতে পারে। (ক) জন্মসূত্রে (by birth) নাগরিকতা অর্জন, (খ) অনুমোদন দ্বারা (by naturalisation) নাগরিকতা অর্জন। জন্মসূত্রে নাগরিকতা অর্জনই হল স্বাভাবিক পদ্ধতি। সুতরাং জন্মসূত্রে অর্জিত নাগরিককে স্বাভাবিক নাগরিক (natural born citizen) বলা হয়। অপরদিকে অনুমোদনের দ্বারা অর্জিত নাগরিককে অনুমোদনসিদ্ধ (naturalized) নাগরিক বলে।

(ক) জন্মসূত্রে নাগরিকতা অর্জনের দুটি নীতি আছে: (১) রক্তের সম্পর্ক নীতি (Jus Sanguinis) এবং (২) জন্মস্থান নীতি (Jus Soli)।

সংবিধান প্রবর্তনের পর (১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারির পর) নাগরিকত্ব অর্জন সম্পর্কে অন্যান্য দেশের মতো ভারতেও কয়েকটি মূল নীতি মেনে চলা হয়।

এই নীতিগুলি হল— জন্মস্থান (Jus Soli), রক্তের সম্পর্ক (Jus Sanguinis), নিবন্ধীকরণ (registration), অনুমোদন (naturalization) এবং ভূখণ্ডের অন্তর্ভুক্তি (incorporation of territory)।

১৯৫৫ সালের ভারতীয় নাগরিকতা আইন অনুসারে তিনটি কারণে নাগরিকতার বিলোপ হতে পারে। তা হল: (ক) পরিত্যাগ (Renuciation), (খ) খারিজ (Termination) এবং (গ) বঞ্চিতকরণ (Deprivation)।

Bellamy বলেছেন বর্তমান যুগে একটি প্রধান সমস্যা হল উন্নত গণতন্ত্রগুলিতে নাগরিকদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণে অনীহা। বেল্লামি লক্ষ করেছেন, "a slow but steady decline in voter turnout and trust in politicians within all the established democracies"। J.K. Galbraith-এর ভাষায় সমৃদ্ধিশালী 'Contented majority' রাজনীতিকে এড়িয়ে চলেন। তাই অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্র (participatory democracy) আজ সংকটের মুখে।

নাগরিকত্ব ধারণার ঐতিহাসিক বিবর্তন (Historical Development of the Concept of Citizenship)

ইংরাজি 'citizenship' শব্দটি ল্যাটিন 'civis' এবং গ্রিক 'polites' থেকে এসেছে— যার অর্থ একই 'city' বা নগরের বাসিন্দা। তবে সমান অধিকার ও কর্তব্য সম্বলিত নাগরিকত্বের ধারণা ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে ফরাসি বিপ্লবের পর থেকে এসেছে। পুঁজিবাদ ও উদারনীতিবাদের বিকাশের সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। ১৯৮০-র দশক থেকে বিশ্বায়ন (globalization) এবং সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদ (multiculturalism)-এর যুগে নাগরিকত্বের চিরায়ত ধারণা এখন চ্যালেঞ্জের সম্মুখে।

অনুপমা রায় নাগরিকত্ব ধারণার বিকাশে চারটি ঐতিহাসিক পর্যায়কে চিহ্নিত করেছেন। এগুলি নিম্নরূপ:

ক) ধ্রুপদী গ্রিক-রোমান পর্যায় (যা খ্রিস্টপূর্ব চার শতক থেকে শুরু): নাগরিকত্ব সম্পর্কে গ্রিকদের ধারণা ছিল শাসনকার্যে সক্রিয় অংশগ্রহণ। তবে এই নাগরিকতা সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে ছিল সীমাবদ্ধ, শুধুমাত্র ২১ বছর বয়স্ক 'স্বাধীন' পুরুষরাই এই অধিকার ভোগ করতেন। নারী, বিদেশি বা 'metics' এবং ক্রীতদাসরা নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত ছিলেন। প্রাচীন রোমে নাগরিকত্বের ধারণা ছিল ভিন্ন। সেখানে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের পরিবর্তে নাগরিকত্বকে একটি 'legal status' বা আইনি মর্যাদা হিসেবে দেখা হত। নাগরিকের ভূমিকা ছিল খানিকটা নিষ্ক্রিয় বা

Scanned by CamScanner

passive;তবে গ্রিকদের তুলনায় তার বিস্তার ছিল অনেক বেশি। অনেক ধরনের মানুষকে রোমান সাম্রাজ্যের মধ্যে অনুগত করে রাখার জন্য, অনুপমা রায়ের ভাষায়, এক ধরনের 'imperial inclusiveness' ছিল রোমের শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ সাম্রাজ্য রক্ষার স্বার্থে অন্তর্ভুক্তিকরণ বা সবাইকে নিষ্ক্রিয় সদস্য হিসেবে আইনি মর্যাদা দিয়ে নাগরিকত্ব প্রদান করা। ম্যাকিয়াভেলি অবশ্য রোমের সাধারণতন্ত্রের যুগে 'civic virtue'-র ওপর গুরুত্ব দেন।

খ) মধ্যযুগের শেষভাগ ও আধুনিক যুগের প্রাক্কালে নাগরিকতা ধারণার পুনর্গঠন: ষোড়শ শতাব্দী নাগাদ নাগরিকত্বকে একটি 'legal status' বা আইনি মর্যাদা হিসেবে দেখা একটি প্রতিষ্ঠিত মতবাদের চেহারা নেয়। বোদাঁ বললেন, নাগরিক কিছু অভিন্ন সাধারণ অধিকার ভোগ করে এবং রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের দ্বারা সুরক্ষিত হয়। গ্রিকদের 'active citizenship'-এর ধারণা বা ম্যাকিয়াভেলির 'civic virtue'র ধারণার থেকে এই নিষ্ক্রিয় আইনি মর্যাদার ধারণা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। ১৭৭৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা ঘোষণা (Declaration of American Independence) এবং ১৭৮৯ সালে ফরাসি বিপ্লবের পর 'মানুষ ও নাগরিকদের অধিকার ঘোষণা' (Declaration of the Rights of Man and Citizen) স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের ধারণা (free and autonomous individual) সুপ্রতিষ্ঠিত করে। জাতীয়তাবাদের প্রসার ও জাতীয় রাষ্ট্র গঠন প্রক্রিয়া নাগরিকতা ধারণাটিকে প্রসারিত করে।

গ) ১৯ ও ২০ শতকে উদারনীতিবাদ ও পুঁজিবাদের প্রসারের প্রেক্ষিতে নাগরিকতা: সামন্ততন্ত্রের অবসান, পুঁজিবাদের উত্থান এবং উদারনীতিবাদের প্রসার নাগরিকতার ধারণায় পরিবর্তন নিয়ে আসে। ডেরেক হিটার (Derek Heater) তাঁর Citizenship: The Civil Ideal in World History গ্রন্থে বলেছেন ব্যক্তিগত অধিকারের ধারণা ও সামাজিক শ্রেণির গণ্ডী পেরিয়ে ব্যক্তিগত সচলতা (individual mobility)-র সম্ভাবনা নাগরিকদের মধ্যে একটি রাজনৈতিক সমাজে সাম্যের ধারণাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। এপ্রসঙ্গে ইংরেজ চিন্তাবিদ টি.এইচ. মার্শাল (T.H. Marshall)-এর অবদান উল্লেখযোগ্য। মার্শাল তাঁর ১৯৫০ সালে প্রকাশিত 'Citizens and Social Class' রচনায় ইংল্যান্ডে নাগরিকত্বের প্রসার নিয়ে এক বিশ্লেষণে নাগরিকদের অভিহিত করেন একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্বাধীন ও সমানাধিকার ভোগকারী সদস্য ("free and equal members of a political community") হিসেবে। এই রচনায় মার্শাল নাগরিকত্বকে বিশ্লেষণ করেন একটি প্রক্রিয়া হিসেবে যার মাধ্যমে পুঁজিবাদী সমাজের অন্তর্নিহিত

বৈষম্যের বিপরীতে সাম্যের বিস্তার ঘটে। মার্শাল এই রচনায় তিন ধরনের অধিকারের শ্রেণিবিভাগ করেন— পৌর অধিকার (Civil Rights), রাজনৈতিক অধিকার (Political Rights) এবং সামাজিক অধিকার (Social Rights)। পৌর, রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকারের এই তিনটি পর্যায় মার্শালের মতে, ইতিহাসের তিনটি পর্বের, তিনটি শতাব্দীর বিবর্তনের সঙ্গে যুক্ত— পৌর অধিকার অষ্টাদশ শতাব্দীর, রাজনৈতিক অধিকার উনবিংশ শতাব্দীর এবং সামাজিক অধিকার বিংশ শতাব্দীর ইতিহসের সঙ্গে যুক্ত।

মার্শাল যে রাজনৈতিক সাম্যের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন সেই ধারণা বিশ্লেষণ করে অনুপমা রায় দেখিয়েছেন এর মধ্যে একটা স্তরবিন্যাসগত বৈষম্য বা 'hierarchical inequalities'-কে ঢেকে রাখার প্রচেষ্টা রয়েছে। প্রতিটি ব্যক্তি যেন তার শ্রেণিগত, লিঙ্গগত, সামাজিক অবস্থান প্রভেদ বা পরিচিতিকে ঢেকে রেখে একটা সমান নাগরিকত্বের মুখোশ (the citizen is like an individual wearing a mask) পরে রয়েছে একটি উদারনৈতিক রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যে।

আইনের দিক থেকে সকলে সমান— নাগরিকত্বের এই আনুষ্ঠানিক বাহ্যিক প্রদর্শন— যা পুঁজিবাদের ও উদারনীতিবাদী রাষ্ট্রের মতাদর্শের সঙ্গে খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ— এই ধারণাকে মার্কসবাদীরা, নারীবাদীরা এবং সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদীরা তীব্র সমালোচনা করেছেন।

মার্কসবাদীরা উদারবাদী ধারণার সমালোচনা করে বলেছেন যে ধনবৈষম্যমূলক বুর্জোয়া রাষ্ট্রে আইন শুধুমাত্র বিত্তশালীদের স্বার্থরক্ষা করে। আইনের চোখে বুর্জোয়া সমাজে মেহনতি মানুষ কোনোদিনই সমান হতে পারে না। বুর্জোয়া তত্ত্বকে স্বীকার করে নিলে বিত্তবান কর্তৃক বিত্তহীনদের উপর অত্যাচার স্বীকার করে নিতে হয়; যা অত্যন্ত অমানবিক। অর্থনৈতিক সাম্য ছাড়া নাগরিকের রাজনৈতিক অধিকার মূল্যহীন।

নারীবাদীরা সম্পূর্ণ পৃথক দৃষ্টিকোণ থেকে নাগরিকত্বের উদারবাদী ধারণার সমালোচনা করেছেন। তাঁদের মতে, 'citizenship is gender-blind' অর্থাৎ এখানে নারীর বিশেষ চাহিদা বা অধিকারকে উপেক্ষা করা হয়েছে। নারীবাদে চলে আসে নারীর শোষণ-দমন-পীড়ন-বঞ্চনার ইতিহাস, পরিবারের মধ্যে (Personal is Political), বিশেষত পুরুষতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে নারীর অবস্থানের ইতিহাস। এখানে চলে আসে নারীকে বাদ দেওয়া বা exclusion-এর ইতিহাস— প্রাচীন গ্রিসে মহিলারা নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত ছিলেন; এমনকি ইউরোপের বহু দেশে দীর্ঘ লড়াইয়ের পর নারীরা ভোটাধিকার লাভ করেছেন। শেফালী মৈত্রও

তাঁর 'নারীবাদ ও নৈতিকতা' গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে ইংল্যান্ডে প্রথমদিকে মেয়েদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে অন্তত চারটি বিশেষ যোগ্যতা অর্জন করতে হত: ২১ বছর বয়স্ক হতে হবে; বিবাহিত হতে হবে; নিজের নামে স্থায়ী সম্পত্তি থাকতে হবে এবং শ্বেতকায় অ্যাঙ্গলো-স্যাকসন হতে হবে। নারীবাদী তাত্ত্বিক Rian Voet "an active and sex-equal citizenship" অর্থাৎ সক্রিয় ও লিঙ্গ-নিরপেক্ষ নাগরিকত্বের ডাক দিয়েছেন। পুরুষতন্ত্র নারীর পৃথক অস্তিত্বকে অস্বীকার করে। নারীবাদ নারীর স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করতে চায়। নারীবাদ নারীর ক্ষমতায়ন (empowerment of women) দাবি করে, কারণ প্রচলিত সমাজব্যবস্থার সর্বস্তরে পুরুষের প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। আগে নিছক সামাজিক-অর্থনৈতিক সমস্যা হিসেবে নারীর সমস্যাকে বিচার করা হত। নারীর সমস্যাসমূহের জন্য যে স্বতন্ত্র তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ অপরিহার্য তা অনুভব করা হয়নি। রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার সংক্রান্ত ঘোষণায় তাই বলা হয়েছে যে সব মানুষই জন্ম থেকে স্বাধীন এবং সমানাধিকার ও সম্মানের অধিকারী।

ঘ) **সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদ বা বহুসংস্কৃতিবাদ (Multiculturalism), গোষ্ঠীগত অধিকার (Community Rights) এবং বিশ্বায়নের প্রেক্ষিতে নাগরিকত্ব নিয়ে নতুন বিতর্ক:** সাম্প্রতিককালে বহুসংস্কৃতিবাদ বা সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদ নাগরিকত্ব প্রশ্নে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য মেনে নিয়ে একই অঞ্চলে সকলের একসঙ্গে অবস্থিতি— এই হল বহুসংস্কৃতিবাদের মূলকথা। বিশ্বায়নের ফলে immigration বা অভিবাসন প্রক্রিয়া বৃদ্ধি পেয়েছে। বহুসংস্কৃতিবাদের প্রভাবে নতুন অধিকার চেতনার সৃষ্টি হয়েছে যথা minority rights বা সংখ্যালঘুর অধিকার। এমতাবস্থায় পুরাতন বা সাবেকি নাগরিকতা ধারণার পুনর্গঠন করা দরকার। ম্যারিয়ন ইয়ং (Marion Young) 'differntiated citizenship'-এর কথা বলেছেন। এর মূল কথা হল বিভিন্ন স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীকে, সদ্য আগত অভিবাসী, বিভিন্ন ধর্মীয় ও 'ethnic' গোষ্ঠীকে মর্যাদা দান। উইল কিমলিকা (Will Kymlicka) বহুসংস্কৃতিবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে তিন ধরনের গোষ্ঠীগত অধিকারের কথা বলেছেন। এগুলি হল: (ক) স্ব-শাসনের অধিকার (Self-Government Rights), (খ) গোষ্ঠীগত বহুত্ববাদের অধিকার (Polyethnic Rights) এবং (গ) বিশেষ প্রতিনিধিত্বের অধিকার (Special Representation Rights)। স্বশাসনের অধিকার বলতে 'Political Autonomy' বোঝায়। Poly-ethnic rights বলতে কিমলিকা বুঝিয়েছেন immigrants বা অভিবাসীদের, সংখ্যালঘু মানুষদের কিছু বিশেষ অধিকার যেমন

ইউরোপের অনেক দেশে ইসলামপন্থী মেয়েদের হিজাব পরায় নিষেধ রয়েছে। বিশেষ প্রতিনিধিত্বের অধিকার হল আইনসভায় বিশেষ গোষ্ঠীর জন্য আসন সংরক্ষণ। এপ্রসঙ্গে উল্লেখ্য ভারতীয় সংবিধানে মহিলা, তপশীলভুক্ত জাতি ও উপজাতিদের জন্য আইনসভায় আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এককথায় multiculturalism চায় অতীত অন্যায়ের প্রতিকার (correction of historical wrongs)।

বিশ্বায়ন, মানবাধিকার ও বিশ্ব নাগরিকত্ব/Cosmopolitan Citizenship-এর ধারণা

বিশ্বায়নকে অনেকে পৃথিবীব্যাপী যোগাযোগ, বিশ্বব্যাপী বাজার-উৎপাদন ব্যবস্থা ও অর্থের চলাচল, তথ্য-প্রযুক্তির অবাধ আদান-প্রদানের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করেন। অধ্যাপক রসন্যু (Rosenau) বিশ্বায়নের কতকগুলি অনন্য বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন। বিশ্বায়নের কতকগুলি ঐক্যসাধনকারী (integrating) সূত্র আছে, যেমন— মুক্ত বাজার, তথ্যপ্রযুক্তি ও মূলধনের বিশ্বব্যাপী সচলতা, জাতীয় আন্তর্জাতিকরণ, বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগঠনের প্রসার, শ্রমের চলাচল (যাকে Footloose labour বলা হয়েছে), যোগাযোগের বিপ্লব ইত্যাদি। একটি Global Civil Society ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে এবং মানবাধিকারের ধারণা প্রসারিত হয়েছে। এই জটিল ও পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে নাগরিকত্বের সাবেকি ধারণা চ্যালেঞ্জের সম্মুখে। বিশ্বায়নের ফলে সমমনস্ক, সম রুচিসম্পন্ন মানুষজনের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান, চিন্তা ও কল্পনার আদান-প্রদান বহু স্তরে, বহু দিকে প্রসারিত হচ্ছে। বিশ্বব্যাপী মানবাধিকার আন্দোলন, পরিবেশ আন্দোলন, নারীবাদী আন্দোলন, যুব আন্দোলন, উপজাতীয় আন্দোলন, সমকামী মানুষদের সমানাধিকারের আন্দোলন সম্প্রসারিত হয়েছে। ব্যক্তি বা নাগরিক এখন অনেক বেশি দক্ষ, অনুভূতিসম্পন্ন ও স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়। তার ফলে ঐতিহাসিক কারণে অন্ধ আনুগত্য প্রদর্শন না করে কর্তৃপক্ষের কাজ বিচার করে আনুগত্য প্রদর্শনের প্রবণতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এখন নাগরিক অনেক বেশি সচেতনভাবে স্থির করে— কখন কতটা কার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করবে। বহুমুখী সংস্কৃতির প্রসার ঘটেছে। বিশ্বব্যাপী ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক আদানপ্রদান বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে পৃথিবীব্যাপী শ্রমবাজারের সচলতা ও occupational mobility বৃদ্ধি পেয়েছে। আবার বিশ্বায়নের কুফল— অর্থনৈতিক বৈষম্য ও জাতীয় রাষ্ট্রের সংকটের বিরুদ্ধে নানা প্রতিবাদী আন্দোলন (উদাহরণস্বরূপ দেহা ও সিয়াটেল উল্লেখযোগ্য) গড়ে উঠেছে। অনেক ক্ষেত্রে ধর্মীয় মৌলবাদ, জাতীয়তাবাদ, উপজাতীয় স্বাতন্ত্র্য ও আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যকে ভিত্তি করে ওই সব আন্দোলন প্রসারিত হয়েছে। তাই

Scanned by CamScanner

নাগরিকত্বকে আজ সংকীর্ণ রাষ্ট্রীয় গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রেখে দেখার দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করতে হবে। সীমানাহীন বিশ্ব বা Borderless World-এ Cosmopolitan Citizenship-এর ধারণা অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক বলে অনেকে মনে করেন। বিশ্বায়নের প্রভাবে বহুসংস্কৃতিবাদ বা multi-culturalism-এর প্রসার ঘটেছে। Yasemin Soysal বলেছেন, "... globalization has brought in a new and more universal concept of citizenship ..."। জাতীয় আনুগত্য বা 'national belonging' এখন আর নাগরিকত্বের প্রধান বিচার্য বিষয় নয়। অনুপমা রায় মন্তব্য করেছেন, "The practice of citizenship in the contemporary world has seen simultaneous and contradictory trends towards both transnational citizenship and fortification of the nation-state boundaries and sovereignty"। অর্থাৎ দুটি পরস্পরবিরোধী প্রক্রিয়া বিশ্বায়নের প্রেক্ষিতে সমান্তরালভাবে চলেছে— একদিকে জাতীয় রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করার প্রয়াস, আবার অন্যদিকে অতিজাতীয় নাগরিকত্ব ধারণার প্রসার। ভৌগোলিক সীমানায় রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব অপ্রতিহত থাকলেও, 'সাইবারস্পেস' তথা মানুষের মনোজগত এখন আর পূর্বের মতো রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন নয়। এই দুই বিপরীত স্রোতের দ্বৈরথে সাবেকি নাগরিকত্বের ধারণা চ্যালেঞ্জের সম্মুখে।

গ্রন্থসূত্র:

১। Bellamy, Richard, *Citizenship.*
২। Roy, Anupama, 'Citizenship' in Bhargava, R and Acharya, A (eds) *Political Theory.*
৩। বসু, দুর্গাদাস, *ভারতীয় সংবিধান পরিচয়।*

Scanned by CamScanner